আর একটি মসজিদ আছে। এই মসজিদটি সাদা। দুটি মসজিদের দিকে তাকালে একটি রূপোর ও অপরটি সোনার বলে ভ্রম হয়।

হীরাঝিল প্রাসাদের উত্তরে মোরাদবাগে ছিল একটি প্রাসাদ। শোনা যায় মোরাদবাগ প্রাসাদে বাস করতেন নবাব আলীবর্দী খাঁ। এই মোরাদবাগ প্রাসাদেই পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস ঃ আধুনিক যুগ

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার বি(দ্ধে ষড়যন্ত্র এবং তাঁর পতন ঃ ১৭০৪ খীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে বাংলা সুবার (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার) দেওয়ানী বিভাগ মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। বাংলা সুবাকে সমৃদ্ধ করার জন্য নানা প্রকার সংস্কার প্রবর্তন করেন। বস্তুতঃ তিনি বাংলায় স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আমল হতে নবাব আলীবর্দীর আমল (১৭৫৬) পর্যন্ত বাংলা সুবা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু আলীবর্দী খানের পরবর্তী নবাব সিরাজ-উদ্- দৌল্লার সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা তথা মুর্শিদাবাদের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের অমানিশা নেমে আসে। নবাবের সেনাপতি ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তি(রা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এই গোপন ষড়যন্ত্র করে যে, সিরাজের পতন ঘটিয়ে মীরজাফর নবাব হবেন এবং ইংরেজরা বাংলায় বিশেষ অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা লাভ করবে।[১] এরপর ১৭৫৭ খীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট সিরাজ পরাজিত হন এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন। চুক্তি(মত সিরাজের পতনের পর মীরজাফর নবাব হন। তিনি কোম্পানীর পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানীর দাবিদাওয়া ত্র(মেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে তা পূরণ করা মীরজাফরের প(ে সম্ভব ছিল না। প্রকৃতপ(ে ১৭৫৭ এর পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজদের প্রধান ল(্যই ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদেরকে তাদের হাতের পুতুল করে রেখে বাংলা সুবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক (মতা লাভ করা। এটা অবশ্যই স্মরণীয় যে, পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি(র দুর্বলতার সুযোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক শক্তি(র উত্থান ঘটে এবং এই শক্তি(গুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ইংরেজরা ভারতকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে তাদের একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। ১৭৪০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের দ(িণ ভারতের কর্ণাটকের যুদ্ধে এবং ১৭৫৭ এর পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে এই উদ্দেশ্যকে কার্যকর এবং সফল করে তুলতে ইংরেজগণ বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। এই জন্য তারা মুর্শিদাবাদের নবাবকে হাতের পুতুলে পরিণত করে প্রকৃত (মতা দখল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

নবাব মীরজাফর ঃ পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানী, ক্লাইভ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়ে মীরজাফর নবাবী শু(করেন। কোম্পানী বিনা শুল্কে বাংলায় অবাধে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। তিনি সব বিষয়ে কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তদুপরি ক্লাইভের উদ্ধত আচরণ, অর্থশোষণ এবং নানাভাবে নবাবের প্রতি অসম্মান-প্রদর্শন ত্র(মেই মীরজাফরের বিরক্তি(র কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইংরেজ বণিকদের (মতা খর্ব করার জন্য ওলন্দাজদের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু ক্লাইভ বিদেরার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করে এই ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেন। ইতিমধ্যে মীরজাফরের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। ফলে তিনি তাঁর সেনাদের বেতন দিতে অ(ম হন। এর প্রতিত্রি(য়া হিসাবে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাহিনী বিদ্রোহ করে এবং মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ ঘেরাও করে। মীরজাফরের এই অসহায় অবস্থার সুযোগে ইংরেজ কোম্পানী হস্ত(েপ করে এবং মীরজাফরকে নবাব পদ থেকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব পদে বসায়।

নবাব মীরকাশিম ঃ মীরকাশিম ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বাংলার মসনদে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত(হতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তিনি ইংরেজদের সব দাবিদাওয়া মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু গু(ত্বপূর্ণ পদ(েপ গ্রহণ করেছিলেন। নবাব পদে আসীন হওয়ার বিনিময়ে তিন কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যদেরকে এবং মুর্শিদাবাদের দরবারে কোম্পানীর রেসিডেন্টকে কুড়ি ল(টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই অর্থ প্রদান করার পরও তিনি কোম্পানীকে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রামের রাজস্বের অধিকার দান করেন। ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত(হয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে বিহারের মুঙ্গেরে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মীর তুরাব আলী খানকে নাইব-নবাব হিসাবে রেখে তিনি, মুর্শিদাবাদের সমস্ত অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও মণিমুক্ত(া মুঙ্গেরে নিয়ে যান।[২] তিনি একটি শক্তি(শালী সেনাবাহিনী গঠন করে তাকে ইউরোপীয় কায়দায় প্রশি(িত করে তুলতে থাকেন এবং মুঙ্গেরে একটি কামান ও বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। তাছাড়া, ইংরেজদের প্রতি সহানুভূতিশীল কর্মচারীদের বিতাড়িত করেন। বলাবাহুল্য, ইংরেজদের প(ে মীরকাশিমের এইসব কার্যকলাপ সহ্য করা সম্ভব ছিলনা। অচিরেই কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে দুপ(ে সশস্ত্র সংঘর্ষ বেধে যায়।

নবাব মীরকাশিমের পতন ঃ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট

ফা(খশিয়ার প্রদত্ত ফরমান অনুযায়ী কোম্পানী বঙ্গদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। এই অধিকার কোম্পানীকেই দেওয়া হয়— কোম্পানীর কোন কর্মচারীদের ব্যক্তি(গত বাণিজ্যের জন্য নয়। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারী এবং তাদের অনুগৃহীত ভারতীয় বণিকেরা নিজেদের ব্যক্তি(গত বাণিজ্যের জন্যও দস্তক বা এই ছাড়পত্রের অপব্যবহার করত। এর ফলে একদিকে নবাব যেমন তাঁর বৈধ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হতেন, তেমনি অপরদিকে ভারতীয় বণিকেরা এই অসম প্রতিযোগিতায় (তিগ্রস্ত হ'ত। এছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের কর্মচারী ও জমিদারদের কাছ থেকে নানাভাবে উৎকোচ ও নজরানা আদায় করত। দেশীয় কারিগর ও বণিকদের ভয় দেখিয়ে ইংরেজদের কাছে সস্তায় মাল বিক্রি(করতে বাধ্য করত এবং ইংরেজদের পণ্যাদি চার-পাঁচ গুণ বেশী দামে ক্র(য় করতে বাধ্য করত। ইংরেজ ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পীয়ার এই যুগকে 'প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩] মীরকাশিম এ সম্পর্কে বারংবার ইংরেজ কর্তৃপ(ে র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত (ুব্ধ নবাব দেশীয় বণিকদের উপর থেকেও এই বাণিজ্য শুল্ক তুলে দেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থা ইংরেজ বণিকদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। নবাবের এই নির্দেশে পাটনা কুঠির অধ্য(এলিস্ সাহেব উত্তেজিত হয়ে পাটনা শহর দখল করেন। নবাব পাটনা পুণর্দখল করে ইংরেজ কুঠী ধ্বংস করেন এবং এরই ফলে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের প্রকাশ্য যুদ্ধ শু(হয়। ইংরেজ সেনাপতি মেজর এ্যাডামস্ মীরকাশিমের বি(দ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরপর পরাজিত হয়ে মীরকাশিম অযোধ্যায় পলায়ন করেন। সেখানে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিতভাবে তিনি ইংরেজদের বি(দ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে এই সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ আধিপত্য এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মীরকাশিমের সকল আশা নির্মূল হয়। মীরকাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় প্রকৃত স্বাধীন নবাবীর অবসান ঘটে।

মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ শু(হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী তাঁকে পদচ্যুত করে দ্বিতীয়বারের জন্য মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। স্থির হয় যে নবারের দরবারে একজন স্থায়ী ইংরেজ প্রতিনিধি থাকবেন। নবাবের সৈন্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হয় এবং লবণের উপর আড়াই শতাংশ কর ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্যের ে(ত্রে ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয়। এছাড়া তিনি নানা কারণে কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে সম্মত হন। ১৭৬৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পুত্র নজম-উদ্-দৌল্লা সিংহাসনে বসেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে ফেব্রুয়ারী তাঁর সঙ্গে এক চুক্তি(র মাধ্যমে তিনি কোম্পানীর বৃত্তিভোগী পুতুল নবাবে পরিণত হন। স্থির হয় যে নবাব তাঁর সৈন্যদল ভেঙ্গে দেবেন এবং তাঁকে র(ার সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানী গ্রহণ করবেন। কোম্পানীর দ্বারা নিযুক্ত(নায়েব-নাজিম বা ডেপুটি সুবাদার তাঁর হয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করবেন। এই নায়েব-নাজিম একমাত্র কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত(ও পদচ্যুত হবেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫ঃ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রবার্ট ক্লাইভ বাংলার গভর্ণর, কোম্পানীর কমান্ডার-ইন-চীফ্ এবং কোম্পানীর কলকাতাস্থ কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ফিরে আসেন। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে কোম্পানীর (মতা ও মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু কোম্পানীর সেই (মতার কোন আইনগত ভিত্তি ছিলনা। এছাড়া, বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও দিল্লীর নামসর্বস্ব বাদশাহ শাহ্ আলমের সঙ্গে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্ক তখনও নিরূপণ হয়নি। তাই তিনি এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি (১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) দ্বারা অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা ও কোম্পানীর সঙ্গে আত্মর(া মূলক মিত্রতা স্থাপন করেন। যুদ্ধের (তিপূরণ হিসাবে তিনি কোম্পানীকে ৫০ ল(টাকা ও কারা এবং এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি দান করেন। কোম্পানী ইচ্ছা করলে দিল্লী দখল করতে পারত , কিন্তু বাস্তব(ত্রে দিল্লীর সম্রাটের তখন বিন্দুমাত্র (মতা না থাকলেও আইনত তিনিই ছিলেন গোটা ভারতবর্ষের সর্বময় কর্তা। তাই তিনি বাংলা সুবায় কোম্পানীর অর্জিত (মতা ও অধিকারকে আইনত স্বীকৃতি দানের জন্য ১৭৬৫ খ্রীঃ দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে এলাহাবাদের দ্বিতীয় সন্ধিপত্রে (১২ ই আগষ্ট, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) স্বা(র করেন। এই সন্ধির দ্বারা কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ এবং বার্ষিক ২৬ ল(টাকার বিনিময়ে কোম্পানী শাহ্ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানী বিচারের (মতা লাভ করে। এরপর রবার্ট ক্লাইভ নবাব নজম-উদ্- দৌল্লা সঙ্গে এক নতুন চুক্তি(তে আবদ্ধ হন (৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৭৬৫)। চুক্তি(তে স্থির হয় যে, বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাংলার নবনিযুক্ত('দেওয়ান' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নবাবকে বার্ষিক ৫৩, ৮৬, ১৩১ টাকা দেবে। এই টাকা থেকে তিনি নিজেরও ব্যয়নির্বাহ করবেন। এরপর থেকে বাংলার নবাব কোম্পানীর একজন বৃত্তিভোগী ব্যক্তি(তে পরিণত হলেন এবং তিনি সমস্ত দিক থেকে কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। কোম্পানীর

দেওয়ানী লাভ ভারত ইতিহাসে এক গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা। এর দ্বারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরেজদের অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়। কোম্পানীর হাতে দেওয়ানী গেল এবং নবাবের হাতে থাকল ফৌজদারী এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব। তিনি কোম্পানীর হাতের পুতুলে পরিণত হলেন। তাঁর হাতে থাকল (মতাহীন দায়িত্ব। আর কোম্পানীর হাতে থাকল দায়িত্বহীন (মতা। পরের বছর (১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) ক্লাইভ নবাবের সঙ্গে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান হিসাবে মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে অবস্থান করে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের অনুষ্ঠান 'পুন্যাহের' আয়োজন করলেন।[৪] এর কিছু দিন পরই নবাব নজম-উদ্- দৌল্লাও পরলোক গমন করেন এবং তাঁর ভ্রাতা সৈফ-উদ্- দৌল্লা নবাব হলেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈফ-উদ্- দৌল্লা মৃত্যুবরণ করলেন। তারপর তাঁর নাবালক ভ্রাতা মুবারক-উদ্-দৌল্লা নবাব পদে আসীন হলেন। এইভাবে কোম্পানীর হাতের পুতুল হিসাবে নবাবদের একের একের এক মিছিল চলতে থাকল এবং মুর্শিদাবাদ থেকে শাসন ও প্রশাসন সমস্ত কার্যালয় একে একে কলকাতায় স্থানান্তরিত হতে শু(করল।

সুপারভাইজার নিয়োগ ঃ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইংল্যান্ডে প্রত্যাগমন করলেন এবং তাঁর স্থানে কলকাতায় কোম্পানীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন হ্যারি ভেরেলষ্ট। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের কাজ দেখাশোনার জন্য সুপারভাইজার নামক কর্মচারীদের নিয়োগ করা হল। ১৭৬৮-৬৯ এবং ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ দা(ণভাবে কমে গেল। প্রতিটি অঞ্চলেই জমিদাররা রাজস্বের হার কমানোর এবং অনেক(ত্রে রাজস্বের দাবী প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য জোরালো দাবি তুলল কারণ, এই বছরগুলিতে অজন্মা চলছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ কর্তৃক গঠিত বাংলা সুবার এক-একটি 'চাকলা' বিভাগের রাজস্বের বিষয় দেখাশোনার জন্য এক এক জন সুপারভাইজারকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সুপারভাইজারদের নিজ নিজ চাকলার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হ'ত। এই রেসিডেন্ট রাজস্বের গোটা ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করতেন তাই মুর্শিদাবাদ 'চাকলার' জন্য আলাদা কোন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হল না। ১৭৭০ এর শেষের দিকে মুর্শিদাবাদে 'কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অব্ রেভিনিউ' প্রতিষ্ঠা করা হল এবং এই কাউন্সিলকে সুপারভাইজারদের থেকে বেশি (মতা দেওয়া হল। রিচার্ড বীচার এই কাউন্সিলের মুখ্য অধিকর্তা হলেন এবং জন রীড , জেমস্ লাওরেল এবং জন গ্রাহাম ছিলেন এর সদস্যবৃন্দ। মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব-দেওয়ান হিসাবে কাউন্সিলের মিটিং- এ নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন।[৫] ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কন্ট্রোলিং কাউন্সিল অব্ রেভিনিউকে বাতিল করা হয় এবং ঐ বছরেই এর দায়িত্ব দেওয়া হয় নবগঠিত বোর্ড অব্ রেভিনিউকে যা গঠিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদে অবস্থিত 'কমিটি অব্ সার্কিটের' সুপারিশত্র(মে। যেহেতু বোর্ড অব্ রেভিনিউ গঠিত হয়েছিল কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা, সেহেতু রাজস্ব আদায়ের সমস্ত (মতা এবং নীতি নির্ধারণের কাজ মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতায় স্থানান্তরিত হ'ল।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং গভর্ণর হিসাবে ওয়ারেন হেষ্টিংস দায়িত্বভার গ্রহণের পরপরই কাউন্সিল সমগ্র রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংসকে প্রেসিডেন্ট করে একটি 'কমিটি অব্ সার্কিট' গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নদীয়া পরিদর্শন করার পর এই কমিটি কাশিমবাজারে এক অধিবেশনে বসে। ঐ সময়ে স্যামুয়েল মিডল্টনকে মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্ট এবং কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কাশিমবাজারের এই অধিবেশনেই প্রথমবারের মত রাজস্বব্যবস্থার পরিকাঠামোগত পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়। কন্ট্রোলিং কাউন্সিল বাতিল করা হয় এবং ইংরেজ সুপারভাইজারগণকে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা প্রদেশের কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হয়।[৬] সমগ্র সুবার জন্য 'কমিটি অব্ রেভিনিউ' গঠন করা হল এবং এই কমিটির অধীনে প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিল গঠিত হল। বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকায় এই প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি গঠন করা হল। মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধীনস্থ কালেক্টরদের মধ্যে চুনাখালির কালেক্টর অন্যতম ছিল। এই চুনাখালি ছিল মুর্শিদকুলি খাঁর এবং সরফরাজ খাঁর আমলের পুরনো 'কিসমৎ' জমিদারী। তাঁর (কালেক্টরের) অধীনে দ(ণ ও দ(ণ-পূর্ব মুর্শিদাবাদ ছিল।

আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার উত্থান ঃ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বাতিল করে দেওয়া হ'ল। প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টদের কালেক্টর হিসাবে নিয়োগ করা হল এবং এরপর থেকে তাঁরা কলকাতার 'কমিটি অব্ রেভিনিউ' এর নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করবেন বলে স্থির হল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব্ রেভিনিউ বোর্ড অব্ রেভিনিউ হিসাবে রূপান্তরিত হল এবং কালেক্টরদেরকে দেওয়ানী বিচারকের এবং ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল। এইভাবে মুর্শিদাবাদের নিজামতের উপর অধিক (মতা দেওয়া হ'ল কালেক্টরদের। মুর্শিদাবাদ শহরের জন্য একটি পৃথক ব্যবস্থা হ'ল। এখানে বিচার-প্রশাসন দেখাশোনার জন্য একজন বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হ'ল। প্রথম থেকেই বীরভূম ও বিষ(ুপুরের

MURSHIDABAD 3RD CD B # 115
26-9-03

জমিদারীর রাজস্ব সংগ্রহের কাজ মুর্শিদাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্ট দেখাশোনা করতেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূম ও বিষ(ুপুরের জমিদারীকে মুর্শিদাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হ'ল । ১৭৮৬ সালেই আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার উন্মেষ ঘটেছিল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের এবং প্রকৃতপ(ে কলকাতার কোম্পানীর কাউন্সিল রাজস্ব-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপ(হওয়ার পরপরই মুর্শিদাবাদ হতে সব (মতা কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। একটা মোগল সুবার নামমাত্র রাজধানী হিসাবে মুর্শিদাবাদের যেটুকু গু(ত্ব ছিল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্ট তার সমাপ্তি ঘটায় এবং কলকাতাকে কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলের গভর্ণর জেনারেলের প্রধান কেন্দ্র বা রাজধানীতে পরিণত করে। ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির স্থানীয় শাসন গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের হাতে অর্পিত হয়। রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমস্ত অধিকৃত অঞ্চলে আইন প্রণয়ন, শাসন এবং সরকার পরিচালনা করার দায়িত্ব পান।[৭] ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাক্ট অনুযায়ী কলকাতায় একটি 'কোর্ট অব্ জুডিকেচার' প্রতিষ্ঠা হয়। এইভাবে পার্লামেন্টের রেগুলেটিং এ্যাক্ট মুর্শিদাবাদকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী থেকে একটি জেলা শহরে পরিণত করে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঃ ১৭৬৮-৬৯ এবং ১৭৬৯-৭০ এর শস্যহানি এবং অজন্মার জন্য রায়তেরা রাজস্ব প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ এই সময় রাজস্বের হার দ্রুত বৃদ্ধি করতে থাকেন। এ সম্পর্কে জমিদারদের অভিযোগ যাচাই করার জন্য সুপারভাইজার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বস্তুতঃ নায়েব দেওয়ানের চাপে জমিদারগণ রায়তদের নিকট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রাজস্ব আদায় করতে শু(করলে, এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য রায়তেরা বাড়ীঘর ছেড়ে পলায়ন করে, ফলে জমিজমার চাষবাস বন্ধ হয়ে গেল। তাছাড়া, ১৭৭০ সালেই অনাবৃষ্টির জন্য ভয়ঙ্কর অজন্মা দেখা দেয়। এসব কারণে, গোটা বাংলায় বিধ্বংসী দুর্ভি(শু(হয়, পূর্বের বা পরবর্তী কোন দুর্ভি(ের সঙ্গে যার তুলনা করা যায় না।[৮] বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এই ভয়ঙ্কর দুর্ভি(ের করাল গ্রাসে মৃত্যুবরণ করেন। মুর্শিদাবাদ ছিল সর্বাপে(া মারাত্মক ভাবে দুর্ভি(-পীড়িত জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত ইংরেজ রেসিডেন্ট বীচার সাহেব এখানকার দুর্ভি(ের প্রত্য(দর্শী ছিলেন। কলকাতায় পাঠানো তাঁর রিপোর্টে বীচার সাহেব এখানকার দুর্ভি(ের শিকার মানুষের এক ক(ণ ও মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মুর্শিদাবাদের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে গভর্ণর কার্টিয়ার ভালো ভাবেই ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু তবুও নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁর রাজস্বের হার না কমিয়ে বৃদ্ধি করেই চলেছিল। ভয়ঙ্কর সংকট ও দুর্ভি(ের বছরগুলিতে (১৭৬৭-৬৮, ১৭৬৮-৬৯, ১৭৬৯-৭০, ১৭৭০-৭১) দুর্ভি(পীড়িত জনসাধারণের নিকট থেকে বাড়তি খাজনা অত্যন্ত নির্মমতার সঙ্গে আদায় করা হ'ল। এর ফলে পুরনো ঐতিহ্যবাহী জমিদাররা তাঁদের জমিদারী বিক্রি(করে দিতে বাধ্য হলেন। এসব জমিদারী ক্র(য় করল ইংরেজ কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের সঙ্গে বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী এক শ্রেনীর দেশীয় বণিকরা।[৯] দুর্ভি(পীড়িত জনসাধারণের উপর খাজনার বোঝা লাঘব করার কোন পদ(েপ সরকার গ্রহণ করল না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

রেশমশিল্প ঃ মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল রেশমশিল্প। রেশম ও সুতি বস্ত্রের জন্য মুর্শিদাবাদ চিরকালই বিখ্যাত ছিল এবং খ্যাতির চরম শিখরে ওঠে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে। তখন মুর্শিদাবাদের রেশমবস্ত্র সারা বি(ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন ও মধ্যযুগ তথা নবাবী আমলেও এই শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। তবে ইউরোপীয়গণ বিশেষ করে ইংরেজগণের বিনিয়োগ এবং পরিচালনায় রেশমের চাষ, রেশমগুটি পালন, রেশমসুতো তৈরি, বস্ত্রবয়ন, বিপণন ও রপ্তানী সব চাইতে ব্যাপক হয়ে ওঠে। তবে উত্তরভারত থেকে আগত এবং জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে বসতি স্থাপনকারী বণিকরাও এ(ে ত্রে গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।[১০] ১৮৭৬ সালের স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টার-এর রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় যে তখন জেলার ইউরোপীয় পরিচালনাধীন ৪৫টি এবং ভারতীয় বণিকদের পরিচালনাধীন ৬৭টি রেশম ফিলেচার বা রেশম নিষ্কাশন কেন্দ্র ছিল। উৎপাদিত রেশমের (কাঁচা সিল্ক) বেশীর ভাগটাই বিদেশে রপ্তানী হ'ত। জিওঘেগান তার 'সিল্ক ইন ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইতালীয় এবং চৈনিক রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য ছাড়া, মুর্শিদাবাদের রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য ইংল্যান্ডের থেকে অন্যান্য প্রতিযোগীদের বিতাড়িত করে'।[১১] নবাব আলীবর্দী খানের আমলে বছরে গড়ে ৮.৭৫ মিলিয়ন টাকার কাঁচা সিল্ক এবং রেশমবস্ত্র বাইরে রপ্তানী করা হ'ত। এই শিল্পে ইউরোপীয়দের বিনিয়োগ সম্পর্কে বলা যায়, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি ০.৯ মিলিয়ন টাকার রেশম ক্র(য় করেছিল। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল রেনেল লিখেছিলেন, 'কাশিমবাজার বাংলা শিল্পের সাধারণ বাজার ছিল, এবং এক বিশাল পরিমাণ রেশম ও সুতিবস্ত্র এখানে উৎপাদিত হত (এই বস্ত্র এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ত, এর মধ্যে ইউরোপীয় কারখানাগুলি

৩০০,০০০ অথবা ৪০০,০০০ পাউন্ড ওজনের কাঁচা রেশমের ব্যবহার করত'।[১২] কিন্তু রেশম শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে যে বিপুল মুনাফা আসত তার একটা (দ্রাংশই রেশম শিল্পী ও কারিগরদের নিকট পৌঁছাত। আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জের বণিকরাও ইউরোপীয় কারখানাগুলি কর্তৃক পাঠানো রেশমের মূল্যের একটা (দ্রাংশ লাভ করত। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপে রপ্তানীকৃত রেশমের মধ্যে বেশীর ভাগটাই ছিল কাঁচা রেশম বা কাঁচা রেশমজাত বস্ত্র। এক কথায় ইউরোপীয় রেশম শিল্পের জন্য মুর্শিদাবাদ একটা কাঁচা রেশম সরবরাহকারী জেলায় পরিণত হ'ল। ঐতিহাসিক কে. কে. দত্ত তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইংল্যান্ড শুধু কাঁচা রেশম আমদানীতেই আগ্রহ দেখিয়েছিল। এর ফলে মুর্শিদবাদের রেশম বয়ন শিল্পে পূর্বের গৌরব পুন(দ্ধার করতে পারেনি। এ(ত্রে একটাই আশার কথা ছিল যে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্প ১১,০০০ ব্যক্তি(কে নিযুক্ত(রেখেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক আরোপিত শুল্ক চীন ও জাপান হতে প্রচুর পরিমানে রেশম আমদানী করার ব্যবস্থা এবং ইতালীতে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপাদন শু(হওয়া— এ সবই মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের পতন ঘটায়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় সব জমিদার পরিবারগুলির উত্থান ঘটে ওয়ারেন হেষ্টিংস কর্তৃক প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার দ্বারা। কাশিমবাজারের নন্দী পরিবার, কান্দীর সিংহ পরিবার, নসীপুরের সিংহ পরিবার এবং লালগোলার রায় পরিবারের পূর্বপু(ষেরা কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অথবা দেশীয় ব্যবসায়ী ও কোম্পানীর মধ্যে চলতে থাকা বাণিজ্যে দালালের ভূমিকা পালন করে প্রচুর অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন। কোন কোন জমিদার ১৭৭২-৭৭ সময়সীমার মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের খামার-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। যখন পুরনো জমিদারেরা এবং তাঁদের রায়তগণ সময়মত রাজস্বপ্রদানে অ(ম হয়ে পড়েছিলেন, তখনই এইসব নতুন জমিদাররা এই ভূসম্পত্তি লাভ করেন।

কাশিমবাজার রাজপরিবার ঃ কাশিমবাজার রাজ বা জমিদার পরিবারের সৃষ্টির উৎস ছিলেন কালী নন্দী। তিনি জাতিতে ছিলেন 'তেলি' এবং বর্ধমান থেকে এসে কাশিমবাজারের নিকট শ্রীপুরে রেশমের ব্যবসা শু(করেন। তাঁরই প্র-পৌত্র কৃষ(কান্ত নন্দী রেশম, সুপারি, ঘুড়ি ইত্যাদি দ্রব্যের দোকানদার ছিলেন। প্রথমে কান্তবাবু কাশিমবাজার ফ্যাক্টরিতে একজন শি(ানবিশ হিসাবে যোগদান করেছিলেন এবং তারপর ঐ ফ্যাক্টরিতেই একজন করণিকের পদে উন্নীত হন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস কাশিমবাজার ফ্যাক্টরিতে যোগদান করেন তখন তাঁর সঙ্গে কান্তবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ উদ দ্দৌল্লা কাশিমবাজার ফ্যাক্টরি দখল করেন এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস সহ অনেককেই বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যান। ওয়ারেন হেষ্টিংস কান্তবাবুর সহায়তায় মুর্শিদাবাদ হতে পালিয়ে যেতে স(ম হন। একথাও শোনা যায় যে কান্তবাবু নিজগৃহে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে লুকিয়ে রাখেন এবং তাঁকে নদীপথে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ঘটনাত্র(মে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেলের পদে আসীন হলে কান্তবাবুকে 'বেনিয়ান' হিসাবে নিযুক্ত(করেন । গভর্ণর জেনারেল এর বেনিয়ান হিসাবে কান্তবাবু বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করেন। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল ঘোষণা করেন যে, পরবর্তীতে রাজস্ব ব্যবস্থায় কোন ভাবেই বাৎসরিক এক ল(টাকার অধিক কোন ভূ-সম্পত্তি খামার থাকবে না, কোন বেনিয়ান বা কোম্পানীর কর্মচারী জমির খামার করতে পারবেনা। কিন্তু এই ঘোষিত রেগুলেশন লঙঘন করে কান্তবাবুকে ১৩ ল(টাকার খামার সম্পত্তি রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই অবৈধ কাজের জন্য কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরস্ হেষ্টিংসের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁর বি(দ্ধে উত্থাপিত ইম্পীচ্‌মেন্টে এটা একটা অন্যতম অভিযোগ দাঁড়ায়। যদিও জাতিতে কান্তবাবু একজন 'তেলি' ছিলেন, তবুও হেষ্টিংস তাঁকে 'জাতিমালা কাছারির' (ট্রাইব্যুনাল) প্রেসিডেন্ট পদে বসান। যখনই একজন বিচারক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে প্র(া করা হ'ত, তখনই হেষ্টিংস তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসতেন। তেল ব্যবসায়ীরা তেলি-কলুদের অপে(া উচ্চজাত বা উঁচুবর্ণ এই মর্মে একটা রায়কে পাশ করানো তথা সমাজে প্রতিষ্ঠা করানোর জন্য কান্তবাবু নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান করেছিলেন। নবদ্বীপের পন্ডিতরা এই রায় তারপর সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেন।[১৫]

কান্দী রাজপরিবার ঃ কান্দী রাজ পরিবারের উত্থানের মূলে ছিলেন হরেকৃষ(সিংহ নামক একজন উত্তর- রাঢ়ীয় কায়স্থ রেশম ব্যবসায়ী এবং মহাজন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের একজন অন্যতম 'বেনিয়ান' হিসাবে তিনি প্রচুর পরিমাণ অর্থ সম্পদ লাভ করেছিলেন। কথিত আছে তাঁর পুত্র গৌরাঙ্গগোবিন্দ সিংহ কান্দীতে সিরাজের প্রাসাদের কার্ণিসের অনুকরণে নিজ প্রাসাদের কার্ণিস নির্মাণ করেছিলেন। এতে (ব্ধ হয়ে নবাব এই প্রাসাদ ভেঙ্গে ফেলার এবং এর নির্মাতাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। যাইহোক, কান্দী রাজ পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গৌরাঙ্গগোবিন্দ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ । তিনি ওয়ারেন হেষ্টিংসের অন্যতম 'বেনিয়ান' এ পরিণত হন এবং প্রচুর অর্থ-সম্পত্তির মালিক হন। এড্‌মন্ড বার্ক ওয়ারেন হেষ্টিংসের

MURSHIDABAD 3RD CD B # 117
26-9-03

ইম্পীচ্‌মেন্টের সময় অবৈধভাবে অঢেল অর্থ উপার্জন করেছেন বলে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কলকাতা কমিটির 'দেওয়ান' তথা কোম্পানীর রাজস্ব সংগ্রহের প্রধান ভারতীয় এজেন্ট হয়েছিলেন।[১৬]

নসীপুর রাজ পরিবার ঃ মুর্শিদাবাদ (লালবাগ) শহরের নিকটে নসীপুর রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবী সিংহ। দেবী সিংহ ক্লাইভকে সিরাজের বি(দ্ধে পলাশীর যুদ্ধে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এরপর তিনি মুর্শিদাবাদে অবস্থিত 'প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিল' এর সচিব পদ লাভ করেছিলেন। তিনি কোম্পানীর দেওয়ান পদেও উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি পূর্ণিয়া, রংপুর ও দিনাজপুরের বিশাল এস্টেট (ভূ-সম্পত্তি) -এর মালিক হন। কিন্তু তাঁর শোষণ অত্যাচারে অতিষ্ঠপূর্ণিয়া, রংপুর ও দিনাজপুরের কৃষকগন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ শু(করলে তাঁকে 'দেওয়ান' পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। যাইহোক, মুর্শিদাবাদে তাঁর পরিবার কোন জমিদারী পায়নি।[১৭]

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কাশিমবাজার-রাজ, কান্দী-রাজ, এবং লালগোলার রাজপরিবারকে চিরস্থায়ী জমিদারে পরিণত করে। বস্তুতঃপ(এই জমিদার পরিবারগুলি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি(র স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায় এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে সীমাহীন ভাবে শোষণকারী ইংরেজদের সহযোগী হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠায় এসব জমিদার পরিবার অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।[১৮] অবশ্য এই রাজপরিবার গুলিই পরবর্তীকালে জেলার শি(া, স্বাস্থ্য তথা সমাজকল্যাণের (ে ত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে কাশিমবাজার রাজপরিবারের অবদান এ(ে ত্রে সবচাইতে বেশী। এই পরিবারের রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ব্রিটিশবিরোধী অহিংস এবং বিপ্-বী আন্দোলনে নানাভাবে গোপনে সাহায্য ও সমর্থন দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলন

এব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, ভারতে সীমাহীন শোষণ ও নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি ছিল ইংরেজদের প্রধান ল(্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জনসাধারণ ইংরেজদের এই শোষণ ও নির্যাতনের কবলে পড়ে। ইংরেজরা এ দেশের অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের দেশ ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় এবং তারা এদেশের সমৃদ্ধ শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণ ইংরেজদের এই ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ মুখ বুজে সহ্য করেনি। ব্রিটিশ শাসনের সূচনাপর্ব থেকেই তারা বিভিন্নভাবে এই শাসনের বি(দ্ধে সংগ্রাম ও বিদ্রোহ করেছে। ব্রিটিশবিরোধী এইসব বিদ্রোহ ও সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলার জনসাধারণের অবদান কম নয়। বস্তুতঃ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুর্শিদাবাদ বাংলা সুবার মত একটা বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে একটা দরিদ্র জেলায় পরিণত হয়। শোষণ ও নির্যাতনের শিকার জেলার মানুষ তাই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই কখনও সংগঠিতভাবে আবার কখনও বিচ্ছিন্নভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পর্কে একটা বহুল প্রচারিত কথা হচ্ছে এই যে, ' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জেলার তেমন কোন ভূমিকা ছিলনা'। কিন্তু গবেষণালব্ধ নিত্য নতুন তথ্যের আলোকে ধরা পড়ছে যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে এ জেলার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত ইতিহাসে সেইসব তথ্য যথোপযুক্ত(স্থান পায়নি।

সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ ঃ ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে সবচেয়ে (তিগ্রস্ত হয়েছিল দেশের কৃষক সম্প্রদায়। কিন্তু এই কৃষকরা সবসময় ইংরেজদের শোষণ ও অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেনি। বিভিন্ন সময়ে তারা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ করেছিল। এসব বিদ্রোহে মুর্শিদাবাদের অবদান কম নয়। ইংরেজদের শাসনের প্রথম পর্যায়ে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়, তাতে এই জেলার সন্ন্যাসী ও ফকিররাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ সরকার এই সশস্ত্র বিদ্রোহকে ডাকাত বা লুটেরাদের কার্যকলাপ বলে অভিহিত করেছেন। যামিনী মোহন ঘোষ তাঁর 'সন্ন্যাসী এ্যান্ড ফকির রেইডারস্ অব্ বেঙ্গল' নামক গ্রন্থে ইংরেজ সরকারের মনোভাবকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১] কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিক ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের বর্ণনায় এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে প্রকৃত অর্থে এটা একটা কৃষক বিদ্রোহ ছিল।[২] ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শোষণে এবং কোম্পানীর কর্তৃপ(ও তার কর্মচারীদের অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সম্প্রদায় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কখনও পঞ্চাশ হাজারের শক্তি(শালী 'কৃষকবাহিনী' ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ করেছে।[৩] আধুনিক কালের এবং সাম্প্রতিককালের গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, এই বিদ্রোহ মূলতঃ একটা কৃষক বিদ্রোহ ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় 'মাদারী' সম্প্রদায়ের ফকিররা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ জেলায় মাদারী ফকিরদের কতকগুলি প্রাচীন কেন্দ্র আছে- যেমন বহরমপুর থানার গন্নাথপুর, কান্দীর চাঁড়ালপাড়া,

লগাছোলপাড়াও রাঙ্গামাটি, বেলডাঙ্গার মাদারতলা ও নওদার সোনাটিকরীর মাদারতলা ইত্যাদি।[৪] কৃষকদেরকে নিয়ে বিদ্রোহ করার জন্য গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস এই ফকিরদের বি(দ্ধে কঠোর শাস্তির ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণায় বলা হয়েছিল, এই বিদ্রোহে জড়িতদের নিজেদের গ্রামেই ফাঁসি দেওয়া হবে। তাদের পরিবারের সদস্যদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি(করে দেওয়া হবে এবং শাস্তিমূলক করের বোঝা চাপানো হবে।[৫] অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহীদের দমন করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের বিদ্রোহী ফকিরদের সহায়তা করার জন্য রাজশাহী জেলার অনেক গ্রামের উপর শাস্তিমূলক কর চাপানো হয়েছিল।[৬] মুর্শিদাবাদের নবাব বিদ্রোহী ফকিরদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। শাসন ও প্রশাসনে তখনও তাঁর কিছুটা প্রভাব ছিল এবং তাঁর হস্তে(পে চারজন বিদ্রোহীকে সরকার মুক্তি(দেয়। এই চারজন ছিলেন বাংলার সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের প্রধান নেতা মজনু শাহ্‌র শিষ্য।[৭] চেরাগ আলী শাহ্‌ ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিদ্রোহী নেতা। মজনু শাহ্‌র মৃত্যুর পর ফকির বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন চেরাগ আলী শাহ্‌। সন্ন্যাসী নেতা মণিগিরির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার জাফরশাহীতে খাজনা লুট করেন এবং ইংরেজ কোম্পানীর কারখানা থেকে অর্থ আদায় করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাঁধলে মণিগিরির হাতে চেরাগ আলী নিহত হন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়।[৮] চেরাগ আলীর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ নির্মম দমননীতির ফলে এই বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই বিদ্রোহের অবদান কোন অংশে কম নয়। বিশেষ করে পরবর্তীকালে সংঘটিত সশস্ত্র বিদ্রোহগুলিকে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ পথ প্রদর্শন করেছিল বলা যেতে পারে।

আমরা এতদিন জানতাম মহাত্মা গান্ধীই ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর বহু পূর্বে ভারতের মুর্শিদাবাদ, শরণ, ভাগলপুর, বেনারস ও পাটনা এই পাঁচটি জেলায় ১৮১০-২১ খ্রীষ্টাব্দে বাড়ি ও দোকানের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক আরোপিত করের বি(দ্ধে এক শক্তি(শালী আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।[৯] ১৮১০ এর ২৫ নং রেগুলেশন দ্বারা বাড়ি ও দোকানের উপর কর আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখিত জেলাগুলির জনসাধারণ তীব্র প্রতিবাদ শু(করে এবং আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করে। ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটকে জনতা প্রহার করে। কিন্তু সরকারী নথিপত্রে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সবচাইতে ভয়ঙ্কর বলা হয়েছে।[১০] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শোষণে জর্জরিত বেনারসের জনসাধারণ বাড়ির উপর আরোপিত করকে ' কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' বলে আখ্যায়িত করেছে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ ঘোষণা করেছে যে এই কর তাদের উপর কোম্পানী সরকারের ' এক নতুন অত্যাচার'। মুর্শিদাবাদের এ্যাক্‌টিং ম্যাজিস্ট্রেট বাংলার সরকারকে প্রেরিত তাঁর ২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮১১ তারিখের রিপোর্টে লিখেছেন যে, মুর্শিদাবাদ নগরীর জনসাধারণ তাদের বাড়ির উপর আরোপিত করের বি(দ্ধে 'ভয়ঙ্করভাবে বি(ব্ধ হয়ে উঠেছেন'[১১]। তিনি অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে সরকারকে জানিয়েছেন যে এই কর আদায় চালিয়ে যেতে থাকলে মুর্শিদাবাদে আরও শক্তি(শালী ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে এ্যাক্‌টিং ম্যাজিস্ট্রেট ঐ রিপোর্টে আরও লিখেছেন 'খবর পাওয়া গেছে যে নগরের প্রধান প্রধান বণিকরা সকলে কর এড়ানোর জন্য তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে আরম্ভ করেছে। তবে আমি এ ব্যাপারে খুশি যে, তাদের অনেককেই তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে স(ম হয়েছি'।[১২] মুর্শিদাবাদের মানুষ যখন প্রতিবাদে ও বি(ভে ঐ কর বাতিল করাতে ব্যর্থ তখনই তারা নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

বাড়িঘরের উপর কর আরোপ করে যে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং এই কর যে তাদের প(বহন করা সম্ভব নয় তা স্পষ্ট জানিয়ে মুর্শিদাবাদের জনগণ দু'খানি বিস্তারিত দরখাস্ত এ্যাক্‌টিং ম্যাজিস্ট্রেটকে পেশ করে। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর উপরিউক্ত(২৫/২/১৮১১ তারিখের রিপোর্টের সঙ্গে একখানি দরখাস্তের অনুবাদ সরকারকে প্রেরণ করেন। দু'খানি দরখাস্তের মধ্যে একখানি ফার্সী এবং অপরটি বাংলায় লেখা হয়েছিল। সরকারকে পাঠানো দরখাস্তখানি ছিল ফার্সীতে লিখিত দরখাস্তের অনুবাদ। এ্যাক্‌টিং ম্যাজিস্ট্রেট মুর্শিদাবাদের নাগরিকদের দরখাস্ত দুখানির ভাষা ' অত্যন্ত আপত্তিকর' বলে তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ এখানকার জনসাধারণ তাঁদর লিখিত দরখাস্তে পরো(ভাবে সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এবং আরোপিত কর যে তারা মানবেন না এবং এই কর প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত যে তারা আন্দোলনে চালিয়ে যাবেন, তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[১৩] তারা দরখাস্তে লিখেছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আশীর্বাদে পৃথিবীর কোন রাজা তাঁর প্রজাদের অত্যাচার ও নিপীড়ন করতে পারেনা, ইংরেজ ভদ্রলোকগণ একথা ভালভাবেই জানেন। সর্বশক্তি(মান ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি সকলকেই সবরকম (তির হাত থেকে র(া করেন। কিন্তু, এটা আমাদের অত্যন্ত দূর্ভাগ্য যে, কয়েক বছর ধরে আমরা শোষণ ও যন্ত্রণার কবলে পড়েছি। নিপীড়ন ও অত্যাচারের ফলে এবং অসুস্থতার ফলে এই নগরটির (মুর্শিদাবাদ) জনসংখ্যা দা(ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। বলা যেতে পারে, শহরে আর মাত্র অর্ধেক লোক আছে। শহরের উপর আরোপিত কর ও শুল্কের

চাপ এত বেশী যে ১০০ টাকার দ্রব্য/সম্পত্তি ২০০ টাকায় কেনা যাচ্ছে না। কর ও শুল্কের হার দ্বিগুণ, কোথাও বা চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যদি কেউ তার নিজের অস্থাবর সম্পত্তি শহরের বাইরে তার অন্য বাসস্থানে নিয়ে যেতে চায় তাহলে ঐ সম্পত্তির জন্যও নতুন কর না প্রদান করে সে তা করতে পারবেনা। এসবের উপর আবার বাড়ি ও দোকানের উপর নতুন ক'র আরোপিত হয়েছে, যা একটা নতুন অত্যাচার। সরকারের এই কর আরোপের নির্দেশ আমাদের উপর এক ধ্বংসাত্মক আঘাত হিসাবে পড়েছে '। [১৪] ফার্সী দরখাস্তখানি মুর্শিদাবাদের নাগরিকগণ এবং বাংলা দরখাস্তখানি জিয়াগঞ্জের জনগণ প্রদান করেছিলেন। সেই সময় মুর্শিদাবাদ শহরে খাদ্যশস্যের অত্যধিক চড়া দামের জন্য সংকট দেখা দিয়েছিল এবং এখানকার নাগরিকগণ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানিয়েছিলেন যে অতিরিক্ত(কর আরোপের ফলে শহরে কোন শস্য আমদানী করা সম্ভব হচ্ছে না। নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে এবং পরিস্থিতি ভালভাবে সমী(া করে ম্যাজিস্ট্রেট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গৃহ-করের বি(দ্ধে সর্বস্তরের জনসাধারণের অসন্তোষ চরমসীমায় পৌঁছেছে এবং পরিস্থিতি ত্র(মেই বিস্ফোরক আকার ধারণ করছে। তাই তিনি এই মর্মে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া যায় গভর্ণর-জেনারেল ইন-কাউন্সিলের নিকট তার নির্দেশাদি চেয়ে পাঠালেন। গভর্ণর-জেনারেল ইন-কাউন্সিল ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনসাধারণকে বোঝাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ না হলে বি(ব্ধ জনতাকে দমন করার জন্য বহরমপুরে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করার নির্দেশ দিলেন। [১৫] ১৮১১ এর গোটা বছর ধরে মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস, শরণ ও ভাগলপুরে বাড়ি ঘরের উপর আরোপিত করের বি(দ্ধে আন্দোলন চলল। কিন্তু, সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কোম্পানী সরকার উপলব্ধি করে যে যেহেতু বাড়িঘরের বি(দ্ধে সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ আন্দোলনে সামিল হয়েছে সেহেতু সামরিক ব্যবস্থা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে চলে যেতে পারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ২৫ তম রেগুলেশন, ১৮১০ বাতিল ক'রে বাড়ি ও দোকানের উপর আরোপিত কর প্রত্যাহার করে নেয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ২১ শে জানুয়ারী ২৫তম রেগুলেশন বাতিল করা হ'ল, কর প্রত্যাহৃত হ'ল এবং ৫২ তম রেগুলেশন, ১৮১২ দ্বারা এই বাতিলকরণ নিশ্চিত করা হ'ল। [১৬] এইভাবে ইংরেজ সরকারের শাসনের প্রথম পর্যায়েই ভারতীয়দের আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ সফল হ'ল। আর এই ঐতিহাসিক আন্দোলনেও সাফল্যের অংশীদার হয়ে রইলেন মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা গু(ত্বপূর্ণ স্থান আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় অঞ্চলে এই বিদ্রোহের গভীর প্রভাব পড়ে। সাঁওতালরা ছিল কঠোর পরিশ্রমী, শান্তিপ্রিয় ও সরল প্রকৃতির মানুষ। সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর, পালামৌ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলের গভীর বনভূমিতে তারা বসবাস করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে এই অঞ্চল কোম্পানীর রাজস্বের অধীনে আসে। কোম্পানীর কর্মচারী, ভারতীয় মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারে তারা এই অঞ্চল ত্যাগ করে রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল, ভাগলপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলে বসবাস ও চাষবাস শু(করে। তারা এই অঞ্চলের নাম দেয় ' দামিনী-ই-কোহী' বা পাহাড়ের প্রান্তদেশ। কিন্তু এই অঞ্চলেও তারা কোম্পানীর কর্মচারী, জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই পায়নি। সাঁওতালরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জঙ্গলাকীর্ণ পাথুরে জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করেছিল। কিন্তু নতুন ভূমিব্যবস্থায় সেই জমির উপর খাজনা ধার্য করা হয়। খাজনার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দেওয়ার সামর্থ্য তাদের ছিলনা। ফলে তারা জমিজমা ত্যাগ করে পলায়ণে বাধ্য হয় এবং বিদেশী জমিদার ইজারাদারগণ সেই জমি দখল করে। এর ফলে সাঁওতালদের মধ্যে তীব্র (োভের সঞ্চার হয়। কেবল উচ্চহারে খাজনা আদায় করাই নয়, জমিদার ও মহাজনরা তাদের নিকট থেকে বহু প্রকারের উপশুল্ক আদায় ক'রত। নতুন ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তে নগদ অর্থে খাজনা মেটানো হ'ত । তাই তারা মহাজনদের কাছে ফসল বিত্রি(করে নগদ টাকা সংগ্রহ করত। দেশীয় মহাজনরা তাদের ঋণ দিলে ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসা তাদের প(সম্ভব হ'ত না। ঋণের দায়ে তাদেরকে চাষের বলদ, জমির ফসল, জমি এমনকি নিজেকেও হারাতে হ'ত। উইলিয়াম হান্টারের লেখা থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ সাঁওতালেরই সামান্যতম ঋণ পরিশোধ করার মত জমি বা ফসল থাকত না। এমনও দেখা গেছে যে, পিতার মৃত্যুর পর শবদাহের জন্য কেউ মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মুচলেকা দিয়েছে যে, ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে বা তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার মহাজনের দাস হয়ে থাকবে। এই ঋ ণ কখনোই শোধ হ'ত না, কারণ সুদের হার চত্র(বৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেতে থাকত। ফলে সাঁওতাল পরিবার মহাজনের দাস হিসাবে বেগার শ্রম দিতে বাধ্য থাকত। [১৭] সহ্যের সীমা যখন ছাড়িয়ে গিয়েছিল তখনই সাঁওতাল সম্প্রদায় কোম্পানী সরকার, জমিদার ও মহাজনদের বি(দ্ধে শক্তি(শালী বিদ্রোহ শু(করে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ যে কোম্পানী সরকারের সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা সরকারী নথিপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। সাঁওতালরা সরকারের বি(দ্ধে একরকম যুদ্ধ ঘোষণা

করেছে। পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে যে সরকারের আদেশ অনুসারে স্পেশাল কমিশনার কর্তৃক সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভাবিত ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের অঞ্চলগুলির উপর 'মার্শাল-ল' আরোপ করা হয়েছিল। 'মার্শাল-ল' -এর দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছিল, যদি কেউ সরকারের বি(দ্ধে খোলাখুলি শত্রুতা শু(করে বা সরকারের বি(দ্ধে সশস্ত্র বিরোধিতা করে অথবা বিদ্রোহে কোনভাবে জড়িত হয় তাহলে তার 'কোর্ট মার্শালি' এ বিচার করা হবে এবং শীঘ্রই তার মৃত্যুদন্ড কার্যকরী করা হবে।[১৮] ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের বিদ্রোহী সাঁওতালদেরকে বলা হয়েছিল যে যদি তারা দশ দিনের মধ্যে তাদের বিদ্রোহ থামিয়ে দেয় তাহলে তাদেরকে সাধারণ (মা প্রদর্শন করা হবে। আর যদি তারা বিদ্রোহ থামাতে অস্বীকার করে তাহলে অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করা হবে।[১৯] কিন্তু সাঁওতালগণ বিদ্রোহ থামাতে অস্বীকার করে এবং কোম্পানী সরকার, জমিদার ও মহাজনদের নিশ্চিহ্(করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সিঁধু, কানুহ্, চান্দু ও ভৈরবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ও অভিযান চালিয়ে যেতে থাকে। তারা জমিদার, মহাজনদের বাড়িঘর লুঠ করে এবং বিশেষ করে বীরভূমের বিস্তীর্ণ এলাকায় তারা নিজেদের শাসন কায়েম করে।[২০] আতঙ্কিত কোম্পানী কর্তৃপ(কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে সমস্ত ইংরেজ কর্তা ব্যক্তি(সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট টুগুড সাহেব অন্যতম। টুগুড সাহেব মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান ও রঘুনাথপুরের মধ্য দিয়ে তাঁর বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বাধীন '৭ম পদাতিকবাহিনী' পাকুড়ের কাছে সাঁওতালদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে সাঁওতাল নেতা সিঁধু, কানুহ্ এবং ভৈরব আহত এবং বন্দী হন। তারপর এই বাহিনী রঘুনাথপুরে সাঁওতালদের বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত করে এবং সিঁধু , কানুহ্ ও ভৈরবের গ্রাম ভাগনাডিহি পুড়িয়ে দেয়।[২১] বিদ্রোহ প্রভাবিত অন্যান্য অঞ্চলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে সামরিক বাহিনী বিদ্রোহ দমন করে। অসংখ্য সাঁওতালকে বন্দী ও হত্যা করা হয় এবং বিদ্রোহ দমনের পরও তাদের নারী পু(ষদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়। মুর্শিদাবাদের জেমো-কান্দী থেকে প্রচুর খাদ্যরসদ সংগ্রহ করে ম্যাজিস্ট্রেট টুগুড সাহেব বর্ধমান বিভাগের কমিশনার জে. এম. ইলিয়ট কে প্রেরণ করেন।[২২] ঐ রসদ বিদ্রোহ দমনের কাজে লাগানো হয়। বীরভূমের কালেক্টর আর. আই. রিচার্ডসন বিশাল পরিমাণ (৫০০০ পাউন্ড) গম ভাঙ্গানোর জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে ১০০টি চাকি নিয়ে গিয়েছিলেন।[২৩] সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরকারকে 'একটি চমৎকার হস্তীবাহিনী' সরবরাহ করেছিলেন এবং সরকারের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন।[২৪] বন্দী সাঁওতালদের অনেককে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।[২৫] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাঁওতাল বিদ্রোহকে দমন করা হলেও, এই বিদ্রোহ ঊনিশ শতকে ভারতবর্ষের গণসংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় যা ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

ইসলামী পুন(জ্জীবন আন্দোলন (ওয়াহাবী আন্দোলন) ঃ ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রকৃত নাম হল ' তারিখ্-ই-মহম্মদীয়া' অর্থাৎ মহম্মদের প্রদর্শিত পথ। অষ্টাদশ শতকে আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩-৮৭) নামে জনৈক ব্যক্তি(আরব দেশে ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে এক সংস্কার আন্দোলন শু(করেন এবং ধর্মের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারগুলি দূর করে মহম্মদ প্রদর্শিত পথে ইসলাম ধর্মকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায় ওয়াহাবী এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মমত 'ওয়াহাবীবাদ' নামে পরিচিত। ওয়াহাবী কথার অর্থ হল নবজাগরণ। ভারতে এই আন্দোলনের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ভারতে ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর বিখ্যাত মুসলিম সন্ত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর পুত্র আজীজ এই সংস্কার আন্দোলন শু(করেন। সুতরাং সূচনা পর্বে এই আন্দোলন ছিল ধর্মীয় আন্দোলন এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ এই আন্দোলনের সূচনা করলেও ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর অধিবাসী সৈয়দ আহম্মদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীঃ)। সৈয়দ আহম্মদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মের পুন(জ্জীবনের উপর গু(ত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর ধর্মীয় প্রচারের মধ্যে রাজনৈতিক বক্ত(ব্য ছিল স্পষ্ট। তিনি ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন ভারতবর্ষ 'দার-উল্-হার্ব ' বা শত্রুরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষকে ইসলাম বা ধর্মরাজ্যে পরিণত করতে হবে। সৈয়দ আহম্মদের অনুপ্রেরণায় উত্তর ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনে তীব্র রূপ নিয়েছিল। বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন মীর নিসার আলী বা তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)। তিনি চব্বিশ-পরগণার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৯ বৎসর বয়সে মক্কায় হজ্জ করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে পরিচিত হন ও ওয়াহাবী আদর্শ গ্রহণ করেন। অসাধারণ সংগঠন শক্তি(র অধিকারী তিতুমীর সুদখোর মহাজন, নীলকর ও জমিদারদের হাতে নির্যাতিত দরিদ্র মুসলীমদের নিয়ে এক বিরাট সংগঠন গড়ে তোলেন। নির্যাতিত বহু হিন্দুও তাঁর সংগঠনে যোগ

দেয়। তাঁর নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন একটি কৃষক আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ঃ মুর্শিদাবাদে ওয়াহাবী আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়েছিল। সৈয়দ আহম্মদের অনুগামী পাটনার এনায়েতুল্লাহ্ এবং হায়দ্রাবাদের জৈনুদ্দীন বাংলায় এসে 'তারিখ - ই- মহম্মদী' প্রচার করেন এবং পাঞ্জাবের শিখ সরকারের বি(দ্ধে 'জেহাদ'-এর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার চেষ্টা করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি 'জেহাদ তহবিল'ও গঠন করা হয়।[২৬] জনসাধারণ যেন ' দার-উল্-হার্ব' ত্যাগ করে ' দার-উল্-ইসলামে' গমন করে তার প্রচার তিনি চালিয়ে যান। যারা এইভাবে 'দার-উল্-হারব' ত্যাগ করে তাদের ' মুজাহিদ' বলা হত। মুর্শিদাবাদের অনেক মুসলিম নিজেদের অঞ্চল ত্যাগ করে মুজাহিদ হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।[২৭] বাংলার নিম্ন প্রদেশের পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট ডেম্পিয়ার তাঁর রিপোর্টে এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার নারায়ণপুর গ্রামের এক ধর্মসভায় এনায়েতুল্লাহ্ ভাষণ দেন এবং ঐ সভায় উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে দা(ণ উত্তেজনা দেখা যায়। উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশকে ডাকা হয়। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এই রিপোর্ট দিয়েছেন যে, পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ৫০০/৬০০ জন ' মুজাহিদ' তাদের নিজ নিজ বাড়ি পরিত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর এস. বি. লোচ নামক একজন আধিকারিককে প্রেরণ করে মুজাহিদদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। এ ব্যাপারে লোচকে সাহায্য করেন ভারতীয় আধিকারিকগণ এবং বিত্তশালী মুসলমান ভদ্রলোকগণ। তা সত্ত্বে ও অনেকেই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন[২৮]। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিতে পারে এমন সব ওয়াহাবী পরিবারকে চিহ্নি(ত করার জন্য মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহাবীদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছিলেন।[২৯]

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারের বি(দ্ধে যে মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরেই। তারপর ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৭) ইংরেজ শাসন শোষণে জর্জরিত ভারতীয়গণ চূড়ান্তভাবে বি(ব্ধ হয়ে ওঠে। পুরনো রাজা, জমিদার, নবাব, বাদশাহ, কৃষক, শিল্পী, কারিগর, দেশীয় সিপাহী প্রভৃতি সকলেই ব্রিটিশ শোষণের শিকার হয়েছিল। তাই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহ ছিল ভারতীয়দের ইংরেজ সরকারের বি(দ্ধে একটা গণ বিস্ফোরণ। ঐ সময় নতুন এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন করা হয় । এই রাইফেলে যে টোটা ব্যবহৃত হত তার খোলসটি দাঁতে কেটে রাইফেল ঢুকাতে হ'ত। এই খোলসটি গ(ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরী হয়েছিল বলে ভারতীয় সিপাহীরা সন্দেহ করে। এই টোটা ব্যবহারের সময় তাদের ধর্ম বিনষ্ট হবে বলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা মনে করে, কারণ গ(ও শুয়োরের চর্বি তাদের ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই ভারতীয়রা ইংরেজদের শোষণ ও নির্যাতনের বি(দ্ধে যখন বি(ব্ধ হয়ে উঠেছিল তখন এনফিল্ড রাইফেল এবং গো(ও শুয়োরের চর্বি মিশ্রিত টোটার বা কার্তুজের বি(দ্ধে ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহ শু(হয়।

মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অবস্থানরত ব্রিটিশ পদাতিক বাহিনীর ১৯তম রেজিমেন্টের দেশীয় সিপাহীগণ সর্বপ্রথম উপরোক্ত(রাইফেল এবং টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শু(করে। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেই যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ শু(হয়েছিল তা এখন প্রমাণিত সত্য। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এল এস এস ওম্যালি লিখেছেন, ' ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে এবং সংগঠিতভাবে শু(করেছিলেন বহরমপুরের ১৯তম রেজিমেন্টের দেশীয় সিপাহীরা'।[৩০] তদানীন্তন বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক জেমস্ হ্যালিডে তাঁর ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ সালের ' স্টেট্ পেপার রিপোর্ট '-এ স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের প্রথম 'ল(ণ' বহরমপুরেই দেখা যায়।[৩১] ১৮৫৭ এর ২৪ শে ফেব্রুয়ারী ব্যারাকপুর থেকে ৩৪ তম পদাতিক বাহিনীর দুটো দল বহরমপুরে আসে। এই বাহিনীর সিপাহীদের কাছে চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ সম্পর্কে সর্বশেষ খবর পায় ১৯ তম বাহিনীর সিপাহীরা।[৩২] ইতিপূর্বে একজন ব্রাহ্মণ হাবিলদার চর্বি দেওয়া টোটা বা কার্তুজ সম্পর্কে ১৯ তম রেজিমেন্টের কর্ণেল মিচেলকে প্র(্ন করেছিলেন। কর্ণেল মিচেল ছিলেন ((মেজাজের মানুষ। তিনি ঐ সিপাহীকে ধমকে দিয়েছিলেন এবং ২৫ শে ফেব্রুয়ারী কার্তুজ নিয়ে যে রাইফেল ছুড়তে হবে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী কর্ণেল মিচেল ১৯ তম বাহিনীর সিপাহীদের এনফিল্ড রাইফেল এবং কার্তুজ ব্যবহার শু(করতে নির্দেশ দিয়ে নিজ অফিসে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁরা কিছুতেই ঐ কার্তুজ ব্যবহার করবে না বলে জানিয়ে দিল। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের এই দৃঢ় বি(্বাস হয়েছিল যে ইংরেজ সরকার তাদের ধর্ম ও জাতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছে। তাই তারা বিদ্রোহ শু(করল এবং কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করল। তাঁদের নিকট উপস্থিত লেফটেনেন্ট জে এফ, ম্যাকান্ড্রু পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্ণেল মিচেলকে গিয়ে অবগত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বি(ব্ধ কর্ণেল ফিরে এলেন সিপাহীদের কাছে। তিনি তাঁদের কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে কার্তুজ না নিলে তাদের

ভীষণ শাস্তি পেতে হবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে সিপাহীরা যদি কার্তুজ না নেয় তাহলে তাদের ' কালাপানি' পার করে ব্রহ্মদেশে বা চীনে পাঠানো হবে। এরপর সিপাহীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৫ শে ফেব্রুয়ারীর রাত ১০ টার সময় সিপাহীরা সোজা চলে যান ম্যাগাজিনে এবং অস্ত্রাগার ভেঙ্গে জোর করে তাঁরা ম্যাগাজিনের সব বন্দুক তুলে নেন। তারপর বন্দুকে গুলি পুরে সব সিপাহী সোজা লাইনের সামনে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। [৩৩] সিপাহীদের চীৎকার এবং গোলমালে ব্যারাকের সাহেব বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কর্ণেল মিচেলেরও ঘুম ভেঙ্গে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মিচেল সাহেব ব্যারাকের গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রস্তুত করে বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করার জন্য অগ্রসর হন। তিনি অগ্রসর হয়ে দেখেন ৯০০ এরও বেশী বিদ্রোহী সিপাহী গুলি ভর্ত্তি বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্রোহী সিপাহীরা এতই উত্তেজিত ছিল যে তাদের মধ্যে কয়েকজন মিচেলকে সাবধান করে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, তিনি যদি আর এক পাও এগোন তাহলে তাঁরা গুলি ছুড়তে শু(করে দেবেন। কর্ণেল মিচেল তারপর ১৯ তম বাহিনীর সুবাদার মেজর মুরাদ বখ্স ও অন্যান্য দেশী অফিসারদের ডেকে বললেন যে এ ধরনের বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা দরকার। কিন্তু এই দেশী অফিসাররা মিচেল সাহেবকে বিদ্রোহীদের প্রতি হিংসাত্মক হয়ে উঠতে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে সাবধান করে দিলেন যে তাঁর অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী সরিয়ে না নিলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। [৩৪] মিচেল নিজেও পরিস্থিতির গু(ত্ব উপলব্ধি করলেন এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী প্রত্যাহার করে নিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরাও বন্দুক থেকে গুলি বের করে নিয়ে নিজ নিজ বন্দুক অস্ত্রাগারে ফেরত দিয়ে দিলেন। এইভাবে বিদ্রোহী সিপাহীরা শান্ত হলেন এবং রক্ত(পাত এড়ানো সম্ভব হ'ল। [৩৫]

কিন্তু বহরমপুরের ২৫ শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা ১৯ তম রেজিমেন্টের সিপাহীদের ভাগ্য তথা সারা ভারতের রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গভর্ণর জেনারেল- ইন-কাউন্সিল ১৯ তম পদাতিক বাহিনীকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বাহিনীর সেনাদের ব্যারাকপুরের সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হল। তারপর বন্দুক ও কামান দিয়ে ঘিরে রেখে তাদের বরখাস্ত করা হল এবং সেনাপোষাক ছিনিয়ে নেওয়া হ'ল। [৩৬] ব্যারাকপুরের সেনারা বহরমপুরের ঘটনা আগেই জানতে পেরেছিল। বহরমপুরের ঘটনা এবং ব্যারাকপুরে ১৯ তম বাহিনীর বরখাস্ত হওয়ার ঘটনা প্রত্য(ক'রে বি(ব্ধ হয়ে ব্যারাকপুরের ৩৪ তম বাহিনীর একজন ত(ণ সেনা মঙ্গল পান্ডে ইংরেজ সার্জেন্ট মেজরকে গুলি করে। কর্তৃপ(শীঘ্রই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে মঙ্গল পান্ডের ঘটনা ব্যারাকপুরের গোটা বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করেনি। মঙ্গল পান্ডেকে বন্দী করা হয় এবং তাঁকে ৮ই এপ্রিল, ১৮৫৭ তারিখে ফাঁসী দেওয়া হয় । [৩৭] বহরমপুর এবং ব্যারাকপুরের ঘটনা গোটা ভারতবর্ষে দা(ন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ প(দিল্লী , মিরাট, ল(নৌ প্রভৃতি স্থানের সিপাহীগণ বহরমপুর ও ব্যারাকপুরের ঘটনার পর পরই ব্রিটিশ সরকারের বি(দ্ধে বিদ্রোহ শু(করে দেয়। সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'এইটটিন ফিফ্টি সেভেন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯ তম পদাতিক বাহিনীর বরখাস্ত হওয়ার খবর উত্তর ভারতের গ্রামে গঞ্জে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং বরখাস্ত সৈনিকরা গ্রামবাসীদেরকেচর্বি মিশ্রিত কার্তুজের কথা শোনায় এবং জনসাধারণের মধ্যে ' রাজদ্রোহ ' এবং বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয় ।[৩৮] সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন বরখাস্ত সৈনিকরা গোটা দেশকে 'সংত্র(ামিত' করেছে [৩৯]।

বহরমপুর এবং ব্যারাকপুরের উপরিউক্ত(ঘটনাবলী মুর্শিদাবাদের জনসাধারণকে দা(ণভাবে উত্তেজিত করে তুলেছিল। এ সম্পর্কে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রেড প্যাম্ফ্লেট ' এ বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই 'রেড প্যাম্ফ্লেট' লিখেছিলেন ইংরেজ কমান্ডারদের অন্যতম চার্লস্ নেপিয়ারের অধীনে কর্মরত জনৈক ব্যক্তি(। [৪০] মুর্শিদাবাদের মানুষের মধ্যে এমন উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সরকারের বি(দ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ও যুদ্ধ শু(করবে। বস্তুতঃ তাঁরা তখন এই বিদ্রোহের নেতৃত্বদানের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম সৈয়দ মনসুর আলী খান ফেরাদুনজাকে চেয়েছিল। [৪১] নবাবের প্রকৃত (মতা না থাকলেও তাঁর একটা গৌরবজনক উপাধি ছিল যার জন্য তিনি ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ সরকারের বি(দ্ধে বিদ্রোহে জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন। নবাব নিজেও ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ ইংরেজ সরকার তাঁর ভাতা ১৬ ল(টাকা থেকে কমিয়ে ১২ ল(টাকা করেছিল এবং নবাবের অনেক সুযোগ সুবিধা বাতিল করে দিয়েছিল। কিন্তু নবাব ফেরাদুনজা জনসাধারণের অনুভূতিকে কোন গু(ত্ব দিলেন না। বরং ১৭৫৭ এর পলাশীর পুনরাবৃত্তি করে ১৮৫৭ এ র বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর সর্বশক্তি(নিয়োগ করেছিলেন এবং সামরিক সাহায্য দিয়েছিলেন। [৪২] নবাব স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহরমপুরে অবস্থানরত ব্রিটিশ সরকারের ৬৪ তম রেজিমেন্টকে বিদ্রোহ দমনের জন্য ৪৫ টি হাতি এবং তাঁর সব উট দান করেছিলেন। [৪৩] ১৮৫৭ এ র ২১ শে জুন তারিখে জনসাধারণ প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে এই আশঙ্কা ছিল। নবাবের সহায়তায় এই বিদ্রোহ এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং নবাব বিদ্রোহ

দমনে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন এজন্য গভর্ণর-জেনারেল- ইন-কাউন্সিল নবাবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। [৪৪] ব্রিটিশ কর্তৃপ(মুর্শিদাবাদের বিদ্রোহী জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য উপযুক্ত(ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গোটা মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ১৮৫৭ এর ২৩ শে জুন কর্তৃপ(র মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যে মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত ৬৩ তম দেশীয় পদাতিক বাহিনী এবং ১১ তম অনিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনী বিদ্রোহ করেছে। [৪৫] কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। জেলা কর্তৃপ(মুর্শিদাবাদ শহরের শান্তি র(া করে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারের ৮৪ তম এবং ৯৫ তম ইউরোপীয় রেজিমেন্টকে কলকাতা থেকে বহরমপুরে পাঠানো হয়। ১৮৫৭ -এর ডিসেম্বরের শেষে মুর্শিদাবাদে আবার উত্তেজনা দেখা দেয়। তাই বহরমপুরে আরও অতিরিক্ত(ইউরোপীয় সেনা পাঠানো হয়। [৪৬] লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এফ জে হ্যালিডে বহরমপুরের বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন,' বহরমপুরে ইউরোপীয় সেনা পাঠিয়ে এবং বহরমপুরে অবস্থানরত দেশীয় সেনাদের নিরস্ত্র করে বহরমপুর শহরকে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে র(া করা হয়েছে।' [৪৭] সরকারের নির্দেশে বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদ শহরের ও তার চারপাশের স্থানীয় সকল অধিবাসীকে নিরস্ত্র করা হল। [৪৮] জনসাধারণের নিকট থেকে কিছু পুরোনো কামান, ২০০০ বন্দুক এবং রাইফেল বাজেয়াপ্ত করা হল। জঙ্গীপুরে অতিরিক্ত(পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হল এবং এই পুলিশ বাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিলেন সুতির কাছে নৌকা করে কোন 'রাজদ্রোহী' যেন পার না হতে পারে। [৪৯] ঔরঙ্গাবাদের ইংরেজ কর্তৃপ(এই রিপোর্ট করেছে যে ১৯ তম পদাতিক বাহিনীর একজন বরখাস্ত সিপাহী সেখানে 'রাজদ্রোহমূলক' ভাষণ দিচ্ছিল, ভাষণদানরত অবস্থায় তাকে বন্দী করা হয় এবং তাঁর বিচারের জন্য তাঁকে সেসন জাজের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঔরঙ্গাবাদে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে ঔরঙ্গাবাদের পুলিশকে সাহায্য করার জন্য নদীয়ার কমিশনার মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটকে ২০ টি বরকন্দাজ বাহিনী প্রেরণ করেন। [৫০] এইভাবে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৭ এর বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০) ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজদের বি(দ্ধে যে সমস্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলবিদ্রোহ অন্যতম ছিল। বাংলার যে কটি জেলায় নীলচাষ হ'ত তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলা অন্যতম। ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলকরদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বি(দ্ধে মুর্শিদাবাদ, পাবনা, নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় নীলচাষীরা এক শক্তি(শালী বিদ্রোহ শু(করে। মুর্শিদাবাদ জেলাতেই বিশেষ করে নীলবিদ্রোহের সময় পরিস্থিতি মারাত্মক হয়ে ওঠে এবং এখানেই জীবনহানির ঘটনা ঘটে। [৫১] এ জেলায় ১৮৫০ এর দশকে নীলকর সাহেবরা ও তাদের গোমস্তা, কর্মচারী ও লেঠেলরা নীলচাষীদের উপর শোষণ ও নির্যাতন বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিল। এ সময় নীল কুঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং নীল প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন ব্র(মশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপীয় ম্যানেজারদের প(নীলকুঠীর প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের কর্মচারী ও গোমস্তরা যথেচ্ছভাবে নীলচাষীদের অত্যাচার করতে, তাদের ঠকাতে এবং তাদের নিকট থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করতে শু(করে। [৫২] মুর্শিদাবাদের দ(ণ-পূর্বের অঞ্চলগুলিতে রবার্ট ওয়াটস্ন এ্যান্ড কোম্পানীর অনেকগুলি নীলকুঠী ছিল। এই কোম্পানী বিভিন্ন উপায়ে নীলচাষীদের উচ্ছেদ করে ঐ অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকার জমির মালিক হয়ে জমিদারে পরিণত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ককবার্ণ বলেছিলেন যে নীলকর জমিদাররা প্রজা র(া আইনগুলোকে অবাধে লঙঘন করে এবং প্রজারাও নীলকরদের ভয়ে ঐ সব আইনের সাহায্য নিতে সাহস করেনা। [৫৩] অ্যাসলি্ ইডেন সাহেব নীলচাষীদের উপর নীলকরদের অবর্ণনীয় অত্যাচার সম্পর্কে নীল কমিশনের সম্মুখে সা(্য দিতে গিয়ে পাঁচটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রী সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত তাঁর ' মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলচাষ ও নীল বি(োভ' শীর্ষক প্রবন্ধে এ্যাসলী ইডেন প্রদত্ত পাঁচটি ঘটনা সং(েপে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। [৫৪] এই পাঁচটি ঘটনা হ'ল - (১) ১৮৫১ সালে মেসার্স লায়ন্স এ্যান্ড হোয়াইট কোম্পানীর বেনিয়াগ্রাম কুঠীর কর্মচারীদের উপর নিমতলা কুঠির মিঃ মাসেইক্ এর কর্মচারীরা আব্র(মণ চালায়। চরের জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে মারামারির ফলে দুজন লোক নিখোঁজ এই অভিযোগ বিচারে টেকেনি। (২) ১৮৫৩ সালে মিঃ ল্যা(লেটার কাশিয়াডাঙ্গা কুঠীর একজন কর্মচারী কুঠীর অন্য কর্মচারীদের দ্বারা নিহত হন। নিহত ব্যক্তি(বাস্তব বা কল্পিত গ(ছাগল ঢোকার অভিযোগে গ্রামবাসীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে আত্মসাৎ করত, কুঠীতে জমা দিত না। এই মামলায় কয়েকজন দেশীয় কর্মচারীর দশবছর জেল হলেও মিঃ ল্যা(লেটার কোন বিচারই হয়নি। (৩) ১৮৫৩ সালে নুরপুরের জমিদারের লোকেরা যখন জমিদারের জমি চাষ করছিল তখন গঙ্গার অপর পাড়ের মেসার্স টেইলর এ্যান্ড মর্টন কোম্পানীর নুরপুর নীলকুঠীর কর্মচারীরা তাদের বলদগুলি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ বলদগুলো উদ্ধার করতে গিয়ে কায়েম খান নামে জমিদারের একজন লোক বর্শার আঘাতে নিহত হয় এবং গ(গুলি

নীলকুঠীতেই পাওয়া যায়। মামলায় একজন কর্মচারীর ১৪ বছর জেল হলেও মিঃ টেইলরের বিচারই হয় নি। (৪) মিঃ এ্যাস্‌লি ইডেন ১৮৫৪ সাল নাগাদ ঔরঙ্গাবাদে জঙ্গীপুর মহকুমার এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন মেসার্স লায়ন্স এ্যান্ড হোয়াইট কোম্পানীর এবং মিঃ ডেভিড এ্যান্ড্রুর দুই নীলকুঠী নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল করত এবং চাষীদের উপর ভীষণ অত্যাচার চালাত। ইডেনের কথায়, ' আমি সেখানে দেখলাম যেসব চাষীরা নীল বুনতে রাজী হয়না নীলকররা তাদের গ(বাছুর নিয়মিতভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রেখে দেয়'। এর ফলে রায়তদের খুব (তি হচ্ছিল। আমি তদন্ত করে একটা স্থানের কথা জানতে পারলাম। একদল পুলিশ পাঠিয়ে সেখান থেকে ৩০০ গ(উদ্ধার করলাম ও আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম। কিন্তু তা সত্বেও নীলকরের ভয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত চাষীরা গ(গুলি দাবি করতে ও নিয়ে যেতে সাহস করেনি। (৫) ১৮৫৭ সালের চরের জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে কাশিয়াডাঙ্গা কুঠীর ল্যা(লেটা এবং রাজারামপুর কুঠীর হারক্লটস্ এই দুই নীলকরের সশস্ত্র লাঠিয়াল বাহিনী দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে থাকলে ঔরঙ্গাবাদের এ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হার্শেল তাদের ধরতে গেলে তাঁর মাথা কেটে দেওয়া হয়। এই মামলাগুলোর নমুনা থেকেই বোঝা যায় নীলকরেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি, জমিদারের সঙ্গে গন্ডগোল, প্রশাসনের সঙ্গে বিবাদ এবং জনসাধারণের উপর নানা ধরনের অত্যাচারে ব্যাপকভাবে লিপ্ত ছিল এবং সাধারণভাবে আইনের হাত তাদের কাছে পৌঁছানোর মত দীর্ঘ ছিলনা[৫৫]।

এইসব কারণে মুর্শিদাবাদের নীলচাষীরা অন্যান্য জেলার নীলচাষীদের মতই ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। মুর্শিদাবাদ শহরের আট মাইল পূর্বে কালিনগর গ্রামের কৃষকেরা রবার্ট ওয়াটস্ন এ্যান্ড কোম্পানীর নীলকুঠীর দাদন নিতে এবং নীল বুনতে অস্বীকার করায় ঐ কোম্পানীর নীলকুঠীর লাঠিয়ালরা কালিনগর গ্রাম আত্র(মণ করে। কিন্তু ঐ গ্রামের কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে পাল্টা আত্র(মণে চালিয়ে নীলকুঠীর লাঠিয়ালদের তাড়িয়ে দেয়।[৫৬] বালিয়া গ্রামের চাষীরা ঐ অঞ্চলের নীলকুঠী আত্র(মণ করেছিল। বহরমপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন যে বালিয়া গ্রামের রায়তদের মধ্যে দুজন রায়ত কুঠী আত্র(মনের সময় সংঘর্ষে নিহত হন।[৫৭] মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলবিদ্রোহের সবচাইতে ব্যাপক এবং মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল ঔরঙ্গাবাদে। ঔরঙ্গাবাদ নীলকুঠীর কন্সার্নের গোমস্তা মীর তোফাজিল হোসেনের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে রায়তরা বিদ্রোহ শু(করে। এই নীলকুঠীর মালিক ডেভিড এ্যান্ড্রুজ তখন কলকাতাতেই বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুয়োগে গোমস্তা তোফাজিল নানাভাবে রায়তদের উপর অত্যাচার করত। তোফাজিল রায়তদের এই হুমকি দেয় যে, তাকে ৮০ টাকা ঘুষ না দিলে সে তাদের ধান উপড়ে ফেলবে এবং তাদের মেয়েদের নীল কাটতে বাধ্য করবে। রায়তরা ৪০ টাকা দিতে চাওয়ায় গোমস্তা গ্রাম থেকে কয়েকজনকে কুঠীতে ধরে নিয়ে যায়। তাই গোমস্তার এই সব অত্যাচারের বি(দ্ধে একটা গোটা মুসলিম গ্রাম (ে পে ওঠে। গোমস্তা তোফাজিল গ্রামে জমি মাপতে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। ি(প্ত গ্রামবাসী তখনই তোফাজিলকে তাড়া করে। তিন হাজার জন কৃষক মোরাদ, সৌহাস ও লালচাঁদের নেতৃত্বে তোফাজিলকে কুঠী পর্যন্ত তাড়া করে যায়। তোফাজিল কুঠীতে লুকোবার চেষ্টা করল । কিন্তু বি(ুব্ধ রায়তরা কুঠী আত্র(মণ করে তোফাজিলকে বের করে এনে প্রচন্ড প্রহার করে। পাশে ভীত ও অসহায় কুঠীর কর্মচারীরা এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব প্রত্য(করে। এরপর ঐ কৃষকরা কালাপানি কুঠী ও তার ম্যানেজার ম্যাক্লিওডের সহকারী রাইস সাহেবকে আত্র(মণ করার জন্য অগ্রসর হ'ল। খবর পেয়ে আগেই রাইস সাহেব নিজ পরিবার নিয়ে পালিয়ে গেলেন। রায়তদের এই সংঘবদ্ধ ও জাগ্রতরূপ ল(্য করে ঔরঙ্গাবাদ কুঠীর মালিক রায়তদের সঙ্গে একটা আপোষ করার চেষ্টা করলেন এবং গোমস্তার পদ থেকে তোফাজিলকে বরখাস্ত করা হ'ল। রায়তদের তিন নেতা এই আপোষ ও ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হ'ল।[৫৮] মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার নীলকরদের বি(দ্ধে বহু গ্রামের কৃষক ঐক্যবদ্ধ হয় এবং আর নীল চাষ না করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। নীলকর সাহেবরাও ছাড়ার পাত্র ছিল না। ফলে উভয়প(র মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি কতটা বিস্ফোরক হয়ে উঠেছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট, রাজশাহী ডিভিসনের কমিশনার এবং কলকাতার কর্তৃপ(র মধ্যে বিনিময় হওয়া চিঠিগুলোতে । পরিস্থিতি উদ্বেগজনক এবং তা যে কোন সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, একথা উপলব্ধি করে সরকার মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠায় যে বি(ুব্ধ কৃষকদের শান্ত করার জন্য তিনি যেন নীলকরদের সংযত হতে নির্দেশ দেন এবং তারা যাতে নীল বোনার জন্য চাষীদের উপর চাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকে তা যেন সুনিশ্চিত করেন।[৫৯] এইভাবে দেখা যায় নীল বিদ্রোহের ফলে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, পাবনা ও ফরিদপুরে অনেক অঞ্চলে নীলচাষ দীর্ঘদিনের মত বন্ধ হয়ে যায় এবং নীলকুঠীগুলির সংকট চরমে পৌঁছায়।[৬০] কিছু নীলকুঠী টিকে থাকল এবং পরবর্তীকালে কৃত্রিম নীল চালু হওয়া সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।[৬১]

১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলবিদ্রোহ যে ইংরেজ সরকারের

সম্মুখে একটা বিপজ্জনক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরকার বাধ্য হয়েই ইন্ডিগো কমিশন বসিয়ে নীলবিদ্রোহ-সৃষ্ট সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছিল। ইন্ডিগো কমিশনের সুপারিশত্র(মে সরকার এসম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইন করতে বাধ্য হয়। ১৮৬০ এর আইন দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। [৬২] ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে নীলবিদ্রোহের একটা তাৎপর্যপূর্ণ স্থান আছে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই বিদ্রোহ সংঘটিত করে নীলকৃষকরা জয়ী হয়েছিল। আর এই গৌরবময় বিদ্রোহে মুর্শিদাবাদের কৃষকদের অবদান চিরদিন স্বর্ণা(রে লিখিত থাকবে।

মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বের কার্যকলাপে সত্রি(য়ভাবে অংশ গ্রহণ ক'রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে ভারতীয় প্রেস এবং সংবাদপত্র জাতীয় জাগরণে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পথ প্রদর্শন করতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শচীন্দ্রলাল ঘোষ সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ভারতীয় সাংবাদিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হতেই দুই যমজ ভাইয়ের মত কাজ করেছে এবং স্বাধীনতা অর্জনের রাজনৈতিক ল(্য পূরণ পর্যন্ত তারা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে। [৬৩] এব্যাপারে মুর্শিদাবাদ জেলা কিছুটা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে। অবিভক্ত(বাংলায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মফঃস্বলে সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদেই 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' নামে একটা বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। [৬৪] ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল' লেখে, 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' এই শিরোনামায় বাংলা ভাষা ও প্রকৃতির সাপ্তাহিক পত্রিকা ১০ ই মে মুর্শিদাবাদে উদয় হল। এর মতামত উদার এবং খাঁটি বাংলা ভাষায় লিখিত। [৬৫] কিন্তু 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' বেশীদিন টিকতে পারেনি। মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কড়াকড়িতে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হয়। 'সম্বাদ ভাস্কর' নামক কলকাতা থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকা তার ১০ ই এপ্রিল, ১৮৪৯ তারিখের সংখ্যায় লিখেছে যে 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের কোপে পড়ে অকালমৃত্যু বরণ করেছে। [৬৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির জন্য অনেক পত্রিকারই অকালমৃত্যু ঘটে। যদি কোন পত্রিকা জনসাধারণকে শোষণ ও নির্যাতনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের এবং জমিদারদের সমালোচনা করত, তাহলে ব্রিটিশ পুলিশ এবং জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনী ঐ পত্রিকার সম্পাদককে প্রহার করত। [৬৭] কিন্তু এতদসত্বেও এই জেলায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেক পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে 'প্রতিকার', 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা', 'মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি' 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাগুলি একদিকে যেমন জনসাধারণের দাবিদাওয়া ও আশা আকাঙ্খাকে তুলে ধরেছিল তেমনি ব্রিটিশ সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিল। তাদের আলোচনা ও বি(-ষণের যথেষ্ট গভীরতা ছিল। 'প্রতিকার' নামক পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গদেশ অধিকারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছে এবং তাই ৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৬ তারিখের সমালোচনা সংখ্যায় লিখেছে, ইংরেজরা সুদানে ধাক্কা খেয়েছে। তারা রাশিয়ার সঙ্গে বিবাদে কোন লাভ করতে পারেনি। ব্রহ্মদেশের রাজা থীবো দুর্বল তাই তারা তাঁর একজন বি(াসঘাতক মন্ত্রীর সঙ্গে এক ঘৃণ্য চুক্তি(করে তাঁকে পদচ্যুত করেছে। ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে একটা জাতিকে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছে। [৬৮] একই বিষয়ে 'মুর্শিদাবাদ পত্রিকা' সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে। এই পত্রিকা তার ২৭/১/১৮৮৬ তারিখের সংখ্যায় লিখেছে আরবীয়, মিশরীয় এবং জুলু ও বর্মীয় জনসাধারণ ইংরেজদেরকে ঘৃণা করে। [৬৯] পত্রিকা তাই মন্তব্য করেছে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণকে বর্মীয় যুদ্ধের খরচ বহন করতে বাধ্য ক'রে ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছে। এই একই সংখ্যায় পত্রিকাটি লিখেছে, গ্রামের মানুষের বসত বাড়ির উপর কর বসিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। [৭০] আয়করের কঠোর সমালোচনা করে 'প্রতিকার' পত্রিকা তার ২২/২/১৮৮৬ তারিখের সংখ্যা লিখেছে, বিভিন্ন প(থেকে আপত্তি পাঠানো সত্বেও 'আয়কর বিল'কে আইনে পরিণত করা হয়েছে এবং এটা করার সময় কর্তৃপ(জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা ও অনুভূতিকে চূড়ান্ত অবহেলা করেছে। শুধু ভারতীয়রাই নয় উদারপন্থী ইংরেজগণও বজ্রকণ্ঠে একথা বলছে যে এরকম চলতে থাকলে ভারতে বেশীদিন ইংরেজ শাসন টিকতে পারবে না। [৭১] এইভাবে জেলার পত্রিকাগুলি প্রথমভাগে ব্রিটিশ সরকারের সমালোচনা করে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলে এবং এগুলি জেলায় ভারতীয় জাতীয়তা বিকাশের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের (ে ত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র ঃ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে রাজশাহী ডিভিশনাল কমিশনারের সচিব হিসাবে বহরমপুরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে থেতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। রাজশাহী ডিভিশনাল কমিশনারের প্রধান কার্যালয় ছিল বহরমপুরে। [৭২] তার অবস্থান কালে বহরমপুরে কতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। বহরমপুর তখন একটা সাহিত্য সংস্কৃতির

কেন্দ্র ছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র এখানে একটা বৌদ্ধিক পরিবেশ লাভ করেছিলেন।[৭৩] ১৯ শে জানুয়ারী, ১৮৭৩ তারিখে শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়কেপ্রেরিত এক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, বহরমপুরে তিনটি লাইব্রেরী আছে এবং আমার চাহিদা মত আমি গ্রন্থগুলি পেয়েছি। বহরমপুরে বঙ্কিমের সবচাইতে গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল এই যে তিনি বহরমপুরে এক সাহিত্য সভায় 'বঙ্গদর্শন' নামে একটা বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করেন। এই সাহিত্য সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত, পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেডেন্ট দীনবন্ধু মিত্র, ডঃ রামদাস সেন, গু(দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা।[৭৪] শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়কে প্রেরিত ১৪/৩/১৮৭২ তারিখে লিখিত পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিতব্য এই পত্রিকা নির(র জনসাধারণের সঙ্গে শি(তদের যোগাযোগ ও আদান প্রদানের পথ উন্মুক্ত(করবে এবং বাঙ্গালী জাতি তার নিজসত্তাকে চিনতে পারবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য ভাষা-ভাষী, জাত ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হবে।[৭৫] ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে বহরমপুরে বঙ্গদর্শনের প্রকাশনা শু(হয়।[৭৬] বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বঙ্গদর্শনের অফিস স্থাপন করেছিলেন। 'বঙ্গদর্শন অফিস, বহরমপুর' ঠিকানা লিখেই অনেকের সঙ্গে চিঠিপত্র আদানপ্রদান করেছেন।[৭৭] সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে বঙ্গদর্শনের অবদান অপরিসীম। বহরমপুরে তাঁর থাকাকালীন একটা ঘটনা ঘটে। বহরমপুরে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর কমান্ডার কর্ণেল ডাফিন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে তিনি কর্ণেলের বি(দ্ধে স্থানীয় কোর্টে মামলা দায়ের করেন। এই ঘটনায় বহরমপুরের জনসাধারণের মধ্যে দা(ণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বহরমপুরের সব উকিল কর্ণেল ডাফিনকে বয়কট করে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প(এফিডেভিট প্রস্তুত করে। বিচারের সময় অসংখ্য মানুষ কোর্ট প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র জয়ী হন এবং কর্ণেল ডাফিন জনসাধারণকে এড়ানোর জন্য কিছুদিন দরজা বন্ধ পাল্কীতে করে যাতায়াত করেন।[৭৮] বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুর থেকে বিদায় নেন তখন বহরমপুরের মানুষ তাঁকে ব্যাপকভাবে বিদায় সম্ভাষণ জানান। মাত্র সাতদিনের মধ্যে ৫০০০ টাকা চাঁদা তুলে তাঁর বিদায় সম্ভাষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[৭৯]

আলোচ্য সময়সীমায় মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা সাহিত্য সংস্কৃতি তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। বুদ্ধিজীবী ডঃ রামদাস সেন, সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় , জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখেরা এই জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। স্বনামধন্য ভাষাবিদ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই লিখেছেন, 'বহরমপুরে একটা বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল। রামদাস সেন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকবিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন এবং শি(ত বাঙালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম যিনি বৌদ্ধ ধর্মের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ লেখা শু(করেছিলেন। স্বর্গতঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সুপরিচিত প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং বাংলার একজন সাহিত্যিক ছিলেন এবং যাঁর হরপ্পা মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের ফলে বিস্মৃত প্রায় পাঁচহাজার বছরের পুরোনো ভারতীয় সভ্যতার কথা জানা গেছে, সেই তিনি বহরমপুরের সন্তান।'[৮০] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বহরমপুরের অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বহরমপুর বাংলার জনসাধারণকে রাজনৈতিক সংগ্রামে উপযুক্ত(নেতৃত্ব দান করেছে। যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করছে তখন বৈকুণ্ঠনাথ সেন ছিলেন একজন সর্বভারতীয় নেতা। সুতরাং এইভাবে বহরমপুর বাংলার প্রগতির অগ্রভাগে ছিল।'[৮১]

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই -এ (মুম্বাই) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু, বাংলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে মফঃসল বা জেলা শহরগুলোতে অনুষ্ঠিত হত না। এই সম্মেলনকে 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স' বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বলা হ'ত। কলকাতায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৮২] এরপর ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মফঃসল বাংলায় প্রথম বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[৮৩] ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২ রা এবং ৩ রা জুলাই বহরমপুরে এই প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের সহযোগিতায় এই সম্মেলনের জন্য ব্যাপক আয়োজন করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক পত্রিকা এই সম্মেলনের প্রচার করে।[৮৪] বহরমপুরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে 'বহরমপুর স্ট্যান্ডিং কংগ্রেস কমিটি' কে 'বহরমপুর এ্যাসোসিয়েশন' সার্বিক সহযোগিতা করে। এই 'এ্যাসোসিয়েশন' বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিজয়কৃষ(মৈত্র, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, হারাধন নাগ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও, রায় বুধ সিং বাহাদুর প্রমুখদের নির্বাচিত করে।[৮৫] এই প্রাদেশিক সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দু মুসলমান সর্বস্তরের জনসাধারণ দা(ণ

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সাড়া দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনকে সফল করে তুলতে তারা সংগঠকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।[৮৬] 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা দেবকোন্ডা গ্রামের উল্লেখ করে লিখেছে যে সেখানে কয়েক হাজার মানুষ সম্মেলন উপল(একটি সভায় মিলিত হয়েছে। 'দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স' এই শিরোনামে পত্রিকাটি লিখছে, মুর্শিদাবাদ জেলার অভ্যন্তরে পল্লীগ্রামে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে। এবং গত ১৬ তারিখ দেবকোন্ডা গ্রামে এ সম্পর্কে একটা মিটিং হয়েছে। সেখানে তিন হাজার গ্রামবাসী জমায়েত হয়েছে, যার মধ্যে ২ হাজার জন মুসলমান। আসন্ন সম্মেলনে একটা বড় সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করবেন। যখন আমরা মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কথা বলি তখন বোধ হয় এই সত্য আমরা ভুলে যাই যে গ্রাম বাংলার গণ আন্দোলনগুলিতে মুসলমানরা অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে এবং সাংগঠনিক শক্তি(, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং এমনকি আত্মোৎসর্গের (ে ত্রে তারা তাদের হিন্দু ভাইদের অপে(া বেশী অবদান রেখেছে।[৮৭] নীলবিদ্রোহের মত ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিদ্রোহেই মুসলিম গ্রামবাসীরা নেতৃত্ব দিয়েছে।[৮৮] যাইহোক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতি সম্মেলনের চাঁদা তোলা এবং রাজনৈতিক সভা সমিতির প্রয়োজনীয়তা বোঝানো এই দুই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠিয়েছিল। এইভাবে অভ্যর্থনা সমিতি সম্মেলনের ব্যাপক প্রস্তুতি নিল।[৮৯]

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২ রা ও ৩ রা জুলাই বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ল। বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা সম্মেলনের বিভিন্ন কার্যত্র(মে অংশগ্রহণ করল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত একাধিক জাতীয় নেতা এই সম্মেলনে উপস্থিত হন এবং আনন্দমোহন বোস এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।[৯০] সম্মেলনে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্য স্যার ইলিয়টের সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। কিন্তু এই প্রস্তাবেই অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেডেন্ট নিয়োগের প্রতিযোগিতা পরী(া থেকে ভারতীয়দের বাদ দেওয়ার জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।[৯১] তৃতীয় প্রস্তাবে সম্মেলন এই জোরাল দাবী করে যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সম্প্রসারিত করা হোক এবং পৌরসভা ও জেলা বোর্ডগুলিতে সরকারী কর্তৃপ(র হস্ত(প বন্ধ হোক।[৯২] পঞ্চম প্রস্তাবে দুর্নীতি ও অবিচার দূর করার জন্য বিচার বিভাগকে কার্যনির্বাহী কর্তৃপ(হ'তে পৃথক করার দাবী করা হয়।[৯৩] ষষ্ঠ প্রস্তাবে নির্বাচনের নিয়মাবলী ও আইনগুলি পরিবর্তনের দাবী করা হয়, যাতে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বেশি সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য যেতে পারে এবং গ্রামের জনসাধারণের মতামত কাউন্সিলে উপস্থাপিত করা যায়।[৯৪] বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর বিষয়গুলি এবং ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনগুলির প্রস্তাবগুলি প্রায় একই। বস্তুত সর্বভারতীয় অধিবেশনের অনুকরণে প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলো কোন মতেই খাটো করে দেখা উচিৎ নয়। যদিও তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের বি(দ্ধে কোন প্রত্য(সংগ্রামে নামেনি তবুও প্রাদেশিক এবং সর্বভারতীয় সম্মেলনগুলিতে গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা এবং স্বার্থকে তুলে ধরেছিল। গোপালকৃষ(গোখলে তাই সঠিকভাবেই বলেছিলেন, ' কংগ্রেসের ল(্য হচ্ছে, ভারত শাসিত হবে ভারতীয়দের নিজেদের স্বার্থের জন্য '।[৯৫] বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তাৎপর্য এখানেই নিহিত আছে। 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা এই সম্মেলন সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছে যে মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি কৃষ(বল্লভ রায়ের উত্থাপিত স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের উপর প্রস্তাবটি ছিল বৈপ্-বিক।[৯৬] এই সম্মেলন গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাগরণ ঘটিয়ে ছিল। কংগ্রেসের উৎসাহ ও উদ্দীপনার ঢেউ দূর প্রান্তের গ্রামগুলিতে পৌঁছে গিয়েছিল।[৯৭] নানা কারণে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।[৯৮] মুর্শিদাবাদ জেলাই আবার উদ্যোগ গ্রহণ করল এবং অনিশ্চয়তার হাত হতে সম্মেলনকে উদ্ধার করল। এ সম্পর্কে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা তার ১৮/ ৩/১৯০৩ তারিখের সংখ্যায় লিখেছে, 'পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল এবং বহরমপুরের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নেতৃত্বে রাজনীতি সচেতনতা সম্পন্ন বহরমপুরের মানুষ এই সংকট থেকে সম্মেলনকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে আসে। বহরমপুরের জনসাধারণ এই সম্মেলনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে, আগামী এপ্রিল মাসে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।'[৯৯] বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও ডঃ রামদাস সেনের পুত্র মণিমোহন সেনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের সত্রি(য় সহযোগিতায় ১৯০৩ সালে বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনও সার্বিক সাফল্য লাভ করে।[১০০] ১৯০৩ এর বহরমপুর সম্মেলনের একটা অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে এই সম্মেলনেই সর্ব প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংবিধান প্রস্তাবিত, গৃহীত এবং অনুমোদিত হয়। এই সম্মেলন এক সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধান অনুযায়ী চলতে থাকে। এই সংবিধানের কতকগুলি প্রধান ধারা প্রদত্ত হল - (ক) ২৫ জন সদস্য বিশিষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন কমিটি গঠিত হবে যা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সব

কাজ দেখাশোনা ও পরিচালনা করবে , (খ) প্রতিটি জেলায় ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন জেলা কমিটি' গঠিত হবে, (গ) প্রতিটি জেলার 'জেলা কমিটিগুলো' আপন আপন জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণের সমস্যা, অসুবিধা, দাবিদাওয়া আশা আকাঙ্খা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে এবং এগুলির সমাধান এবং পূরণের উপায় সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করবে। কমিটিগুলি তাদের সংগৃহীত সব তথ্য এবং সুপারিশ কলকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কমিটিকে পাঠিয়ে দেবে এবং (ঘ) এর অন্যধারা ও উপধারাগুলি সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুসারেই রচিত হবে। [১০১]

বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনই (১৯০৩) সর্বপ্রথম দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং সম্প্রসারণের উপর গু(ত্ব আরোপ করে। বাংলার স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তে দেশীয় পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করা অপরিহার্য। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বহরমপুরের মণিমোহন সেন স্বদেশী শিল্পের উপর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বক্ত(ব্য রেখেছেন। তাঁর কথায়,'আমাদের কৃষক সম্প্রদায়ের এবং শিল্পী ও কারিগরদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে সরকার, শি(ত সম্প্রদায় এবং জমিদার শ্রেণী বেঁচে থাকে। তাই আমাদের সকলের উচিত এই ল(ল(কৃষক ও কারিগরদের জীবনকে সহজতর এবং সুখকর করে তোলা। পশ্চিমী নয়, স্বদেশী জীবনধারায় আমাদেরকে অভ্যস্থ হতে হবে এবং তা ক'রে আমাদের দেশীয় শিল্পকে বাঁচাতে হবে।' [১০২] এই সম্মেলনের সভাপতি স্পষ্টভাবে বলেন এই দেশে চরম দারিদ্রের এটাই বড় কারণ। তিনি বলেন যে, কৃষি জমির উপর চাপ কমানোর জন্য দেশীয় শিল্পকে উন্নত ও সম্প্রসারিত করতে হবে। 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা তার ২৫ শে মার্চের সংখ্যায় মন্তব্য করেছে যে দেশীয় শিল্পের উপর গৃহীত প্রস্তাব দেশের সর্বস্তরের মানুষের অনুভূতি ও আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন। এই পত্রিকা ১৯০৫-৮ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বেই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উপর মূল্যায়ণ করতে গিয়ে লিখেছে যে পাঞ্জাবের মত বাংলায় একটা সর্বাত্মক স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি ঘটাতে হবে। [১০৩] এইভাবে আরও অনেক গু(ত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে ১৯০৩ এর বহরমপুর সম্মেলন সফল হয়। এক বিশাল সংখ্যক মানুষ এই সম্মেলনে সমবেত হয়। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এই সম্মেলন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। [১০৪]

কৃষ(নাথ কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৩) ঃ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে সর্বভারতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরে এসেছিলেন। তাঁর আগমন উপল(কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্ররা প্রিন্সিপালের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত করে এবং ঐ সভায় তারা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভ্যর্থনা এবং সম্বর্ধনা জানায়। [১০৫] ঐ সভায় ছাত্রদের এত ভীড় হয়েছিল যে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা তাকে 'ত্র(াউডেড্ টু সাফোকেশন' অর্থাৎ 'দমবন্ধ হওয়া ভীড়' বলে উল্লেখ করেছে। তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে ছাত্ররা জাতীয় কংগ্রেসের কার্যত্র(মে এবং দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে তাঁর অতুলনীয় অবদানের কথা উল্লেখ করে। তারা তাদের এই ভাষণে 'ইউনিভার্সিটি কমিশনের' 'ছাত্র স্বার্থ বিরোধী' সুপারিশগুলোর কঠোর সমালোচনা করে এবং গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জনের গোটা শি(ানীতির তীব্র সমালোচনা করে। কমিশনের ঐ সুপারিশগুলোর বিরোধিতা করার জন্য এবং এর বি(দ্ধে একটা শক্তি(শালী প্রতিবাদ আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য তারা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করে। ছাত্ররা তাদের ভাষণে বলে, 'ইউনিভার্সিটি কমিশন' যখন উচ্চশি(ার উপর কুঠারাঘাত করতে প্রস্তুত হচ্ছে তখন আপনিই আমাদেরকে সময়মত সতর্ক করে দিয়েছেন, আপনারই উদ্দীপনায় দেশ জেগে উঠেছে এবং আপনার অতুলনীয় সাহস এবং অদম্য স্পৃহা এবং আপনার প্রেস এবং প্-াটফর্মে সীমাহীন অক্লান্ত প্রচেষ্টা এই কুঠারাঘাতকে আশা করি থামিয়ে দেবে এবং আমরা ইউনিভার্সিটি কমিশনের কঠোর সুপারিশগুলি থেকে রেহাই পাব।[১০৬] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন যে ইউনিভার্সিটি কমিশনের সুপারিশগুলোর তিনি ব্যাপক প্রচার করেছেন যাতে এর ছাত্র বিরোধী প্রকৃতি সকলে জানতে পারে এবং ঐ গুলো প্রত্যাহার করার জন্য প্রতিবাদ আন্দোলন করতে পারে। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'দেশ এই প্রতিবাদ আন্দোলন শু(করে দিয়েছে এবং আমি এটা বলব যে ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্টের বি(দ্ধে সংগঠিত এত উত্তেজনাময়, সর্বাত্মক, সুদূরপ্রসারী আন্দোলনে আমি ইতিপূর্বে দেখিনি।' [১০৭] তিনি বিশেষ করে কমিশন কর্তৃক কলেজ ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে দরিদ্র ছাত্ররা এর ফলে শি(া থেকে বঞ্চিত হবে এবং দরিদ্ররা বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হল গোটা দেশ বঞ্চিত হওয়া। কারণ অতীতের মহান লেখক ও চিন্তাবিদ্ যথা ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, কৃষ(দাস পাল প্রমুখরা সবাই দরিদ্র পরিবার থেকেই এসেছিলেন। তিনি ছাত্রদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি তাদেরকে জাপানের অগ্রগতির দৃষ্টান্ত ল(্য করতে বলেন এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবী এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে

চলার জন্য উপযুক্ত(ভাবে তৈরী হতে পরামর্শ দেন। তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে সক্রি(য় অংশ গ্রহণ করতে তাদেরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে এটাও পরামর্শ দেন তারা যেন প্রথমে নিজেদের নৈতিক এবং ধর্মীয় চরিত্র গঠন করে। তারা যেন সবসময় তাদের সম্মুখে যীশু খ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, গৌতম বুদ্ধ এবং শ্রীচৈতন্য উপস্থিত আছেন মনে করে। [১০৮] সভায় এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্ররা রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট সচেতন ছিল। পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখব যে কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্র শি(কগণ স্বদেশী ও বয়কট (১৯০৫-০৮) আন্দোলনে সক্রি(য়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। এই কলেজ বাংলার বিপ্-বী আন্দোলনগুলিরও একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে কৃষ(নাথ কলেজের অবদান অপরিসীম।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন ১৯০৫-১৯১১ঃ ১৯০৫ -১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে মুর্শিদাবাদ জেলা কোন অংশেই পিছিয়ে ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ তাঁদের লেখায় অবিভক্ত(বাংলার অন্যান্য জেলার অবদানের কথা উল্লেখ করলেও মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের অবদানের কথা উল্লেখ করেননি। সাম্প্রতিককালের গবেষণায় এ জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের উপর বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নাগরিকগণ বহরমপুরের গ্র্যান্ট হলে বহরমপুর এ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এক সভায় সমবেত হন। [১০৯] এই সভায় কলকাতার টাউন হলে ৭ ই আগস্ট (১৯০৫)এর প্রস্তাবিতবঙ্গভঙ্গবিরোধী সভায় জেলার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজারের মহারাজ),নসীপুরের রাজা বাহাদুর , রায়বাহাদুর শ্রীনাথ পাল এবং মণিলাল নাহার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারকচন্দ্র চক্র(বর্ত্তী এবং আর রায়কে নির্বাচিত করা হয়। [১১০] মুর্শিদাবাদ থেকে প্রেরিত কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলকাতার টাউন হলে ৭ ই আগস্টের ঐতিহাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। [১১১] কলকাতার এই সভায় বিলেতী দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্বদেশী ও ভারতের অন্যান্য আন্দোলনে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অবদানের কথা আমরা কিছুটা পরে আলোচনা করব। যাইহোক, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন মুর্শিদাবাদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। লালবাগের (পুরোনো মুর্শিদাবাদ শহর) নবাব বাহাদুর হাইস্কুলের ছাত্ররা এবং সেখানকার হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ সেপ্টেম্বর (১৯০৫) মাসের ৮,৯ ও ১০ তারিখ বঙ্গভঙ্গের বি(দ্ধে শোকপালন করে। ছাত্ররা জুতো, জামা এবং ছাতা ত্যাগ করে এবং কেবল ধুতি ও চাদর পরে খালি পায়ে স্কুলে উপস্থিত হয়। [১১২] কলকাতার ইংরাজী দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মুর্শিদাবাদের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের জন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানায়। [১১৩]

ব্রিটিশ সরকারের হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের একটা ইতিহাস প্রস্তুত করে। [১১৪] এই ইতিহাসে ৩ রা সেপ্টেম্বর (১৯০৫) তারিখে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত এক বিশাল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই সভায় বঙ্গভঙ্গের বি(দ্ধে অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই সভায় বহরমপুর , কান্দী, জঙ্গীপুর, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ যোগ দেয় এবং এই সভায় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বৈকুণ্ঠনাথ সেনের মত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন।[১১৫] ১৯০৫ এর ১৭ ই সেপ্টেম্বর বৈকুণ্ঠনাথের সভাপতিত্বে জিয়াগঞ্জে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় স্থানীয় জমিদারগণ, সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, পান্নালাল সিন্হা, হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ,ব্যাঙ্কারগণ, বণিকগণ, দোকানদার ও দিনমজুর ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের অসংখ্য মানুষ ভারী বৃষ্টিকে উপে(া করে সমবেত হয়েছিল। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্বদেশী আন্দোলনকে জোরদার করার এবং স্বদেশী বস্ত্র কারখানা এবং হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণের অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। [১১৬] 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করে, জিয়াগঞ্জের সভার মত অত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা আর কোথাও ল(্য করা যায়নি। ডোমকল থানা [১১৭] এবং জঙ্গীপুর [১১৮] মহকুমার প্রায় সর্বত্র অনুরূপ স্বদেশী সভা, মিছিল ও আন্দোলন চলতে থাকে। প্রতিটি স্থানে বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশীদ্রব্য গ্রহণ এবং স্বদেশী শিল্পের প্রসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব মিটিং মিছিলে সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করে। [১১৯] ১ লা নভেম্বর, ১৯০৫ তারিখে ভবানীকিশোর চক্র(বর্ত্তীর সভাপতিত্বে বহরমপুরে একটা বড় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সভায় 'পিপ্ল্স প্রোক্লাম্যাশন' পাঠ করা হয় এবং ছাত্রদের উপর আরোপিত সরকারী সার্কুলার (কার্লাইল সার্কুলার) অমান্য করে তাদেরকে স্বদেশী আন্দোলন চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয় । [১২০] ২০ শে নভেম্বর (১৯০৫) তারিখের বহরমপুরের অনুরূপ একটি সভায় সেই সব স্পেশাল কনস্টেবলদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানানো হয়, যাদের কে সরকার স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানোর এবং দেশপ্রেম প্রকাশ করার জন্য হুমকি দিয়েছে। [১২১]

কান্দী মহকুমায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়ে। জেমো কান্দী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক শক্তি(শালী স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত করেন রিপন কলেজের তদানীন্তন অধ্য(এবং

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।[১২২] তাঁর নেতৃত্বে এই অঞ্চলের জনসাধারণের এক বিশাল মিছিল ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বি(দ্ধে ে(-াগান দিতে দিতে রাস্তা পরিত্র(মা করে। ১ লা নভেম্বর (১৯০৫) অনুরূপ একটি মিছিল স্থানীয় নদীর তীরে হোমতলায় সভা করে। সমাজের নারীপু(ষ হিন্দু মুসলমান সকলেই এই আন্দোলনে যোগ দেয়।[১২৩] ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিন জেমো-কান্দীর মানুষ সব দোকান পাট বন্ধ রেখে হরতাল পালন করে।[১২৪] স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সময় কান্দীতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সবচাইতে গু(ত্বপূর্ণ কাজ হল 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' নামক এক দেশাত্মবোধক পুস্তক রচনা। বঙ্গভঙ্গ-এর প্রতিকারের জন্য, হিন্দু মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি র(া এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য এই ব্রতকথা পাঠ করে বঙ্গের নারীরা বাংলার সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর নিকট প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প করে।[১২৫] ১৩১২ বঙ্গাব্দের (১৯০৫খ্রীঃ) পৌষমাসে প্রথম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রকাশিত হয় এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে বই আকারে এটা প্রকাশিত হয়।[১২৬] 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'র একটা মূল কপি এখনও কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে র(িত আছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার' ভূমিকায় লিখেছেন যে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার দিন তাঁর মায়ের ডাকে পাঁচশত মহিলা তাঁদের পরিবারের বিষ(মন্দিরের উঠোনে সমবেত হয় এবং 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ করেন, তাঁর কন্যা গিরিজাদেবী।[১২৭] এই দিন অরন্ধন পালিত হয় আর রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পুস্তকখানি সমগ্র বাংলার জনসাধারণকে বিশেষ করে মহিলাদেরকে হিন্দু মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য আহ্বান জানায়। জনসাধারণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে এবং স্বদেশী আন্দোলনে তথা বিপ-বী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে মানুষকে প্রেরণা জোগায়।[১২৮] বাংলায় বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ও পুলিশ উদ্বিগ্ন হয়ে এই পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১০ সালে সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করে। ইন্টেলিজেন্স (সি আই ডি বেঙ্গল) বা গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তৃপ(এক রিপোর্টে লিখেছেন, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুলিশ কমিশনারের কাছে এই মর্মে লিখিত মুচলেকা দিয়েছেন যে এই পুস্তকের আর কোন প্রকাশনা করবেন না এবং পুস্তকটির যে কপি গুলি তখনও বিত্র(য় হয়নি সেগুলি প্রকাশকের নিকট থেকে নিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে জমা দিবেন।[১২৯] পরবর্তী রিপোর্টে পুলিশ কমিশনার লিখেছেন,'আমার পূর্ববর্তী রিপোর্ট অনুযায়ী বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুলিশ কমিশনারের নিকট তাঁর পুস্তকের (বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা) ১,৯৬১ খানি কপি জমা দিয়েছেন।'[১৩০] এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা স্বদেশী আন্দোলনের সম্প্রসারণে, জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ প্রচার করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটা উপলব্ধি করেই উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ কর্তৃপ(বইখানিকে বাজেয়াপ্ত করে ছিল। ১৯০৫ এর পরবর্তী বছর গুলিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ঠা মে তারিখে বহরমপুরে মোহিনীমোহন রায়ের সভাপতিত্বে একটা মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং লেখক নিখিলনাথ রায়ের সভাপতিত্বে আর একটা বড় সভা হয়। এই সভায় বক্ত(াগণ বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধিদের উপর পুলিশের অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় সমবেত সকলে বয়কটের শপথ নেন। সভায় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে।[১৩১] ঐ বছর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে এলে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠে। কাশিমবাজার স্টেশনে এক হাজারের মত মানুষ তাঁকে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান এবং মাল্যদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন উপল(ে ১৫ হাজার মত মানুষের এক বিশাল মিছিল বহরমপুরে পথ পরিত্র(মা করে। ছাত্ররা হরিবাবুর বৈঠক খানায় সুরেন্দ্রনাথের সম্মানে এক সভা করে এবং তাঁকে স্বাগত জানায়। তারপর একটা বিশাল সাধারণ সভায় স্বদেশী আন্দোলনের উপর আলোচনা হয়।[১৩২] ১৯০৮ খ্রীঃ 'সনাতন সম্প্রদায়' নামে নিমতিতায় এক স্বদেশী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান ল(্য ছিল স্বদেশী আদর্শ প্রচার।[১৩৩] ১৯০৯ খ্রীঃষ্টাব্দে বহরমপুরের গোরাবাজার ও উকিলাবাদে ' রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান হয়। এই উপল(ে একটি মিছিল বের হয় এবং দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হয়। রাস্তার দুধার থেকে মিছিলের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হয়।[১৩৪]

কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও স্বদেশী আন্দোলন ঃ স্বদেশী এবং বয়কট আন্দোলনে কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্র শি(কগণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই কলেজের প্রাক্ত(ন ছাত্র এবং বিপ-বী যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন যে শি(কদের অনুপ্রেরণায় কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্ররা ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বি(দ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে এবং মিটিং মিছিলে এই পরিকল্পনা প্রত্যাহারের দাবী জানায়।[১৩৫] ছাত্ররা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে

MURSHIDABAD 3RD CD B # 131
26-9-03

আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে এবং দেশাত্মবোধক গান গেয়ে বিদেশী দ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেটিং করে। তারা ক্লাস বয়কট করে এবং বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করে এবং অন্যান্য কাজের মাধ্যমে স্বদেশী এবং বয়কটের কর্মসূচী পালন করে। তারা এই উদ্দেশ্যে কলেজ হোষ্টেল, বহরমপুরে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন সমিতি গড়ে তোলে ।[১৩৬] অধ্যাপক হীরালাল ছাত্রদের স্বদেশী প্রচারণার কাজ পরিচালনা করেন।[১৩৭] ব্রিটিশ সরকার কার্লাইল সার্কুলার জারী করে ছাত্রদের স্বদেশী ও যেকোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধ করে এবং হুমকি দেয় যে সমস্ত শি(াপ্রতিষ্ঠান স্বদেশী আন্দোলনে অর্থাৎ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা থেকে ছাত্রদের বিরত রাখতে ব্যর্থ হবে সেই সব প্রতিষ্ঠানে সরকারী গ্রান্ট বা অনুদান তথা ছাত্রদের স্কলারশিপ প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হবে।[১৩৮] কিন্তু কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্ররা এই সার্কুলার উপে(া করে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট কার্লাইল সার্কুলার প্রয়োগ করে ছাত্রদের বি(দ্ধে ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ. ই. হ্যালিফক্স তাই কৃষ(নাথ কলেজের বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টর সদস্য বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে সার্কুলারের একখানি কপি পাঠিয়ে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের বি(দ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। [১৩৯] জাতীয় কংগ্রেসের একজন বড় নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন স্পষ্ট এবং কড়া ভাষায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জবাব দেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে এটা স্মরণ করিয়ে দেন যে, কৃষ(নাথ কলেজের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করেন কাশিমবাজারের মহারাজা এবং সরকারের প(থেকে কোন গ্রান্ট-ইন-এইড কলেজে আসেনা তাই এই কলেজে সার্কুলার কার্যকরী নয়। [১৪০] বৈকুণ্ঠ বাবু তারপর কার্লাইল সার্কুলারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন এই সার্কুলার শুধু ছাত্রদের নয় পিতামাতা এবং অভিভাবকদেরও অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। সার্কুলারে বলা হয়েছে ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তাদের শৃঙ্খলা নষ্ট করছে। এর উত্তরে বৈকুণ্ঠনাথ বলেন যে, রাজনৈতিক সভা সমিতি ও মিটিং মিছিলে ছাত্রদের যোগদান কখনই ছাত্রদের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে পারেনা। যে ছাত্ররা রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি অধ্যয়ন করে তাদের প(তাদের মাতৃভূমির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে রাজনীতিতে যোগদান করাটা স্বাভাবিক। [১৪১] এইভাবে বৈকুণ্ঠনাথ সেন পুলিশ ও প্রশাসনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে ছাত্রদের র(া করেছিলেন। এখানে এটা উল্লেখ্য যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং কৃষ(নাথ কলেজের প্রিন্সিপাল একইভাবে পরবর্তীকালের অহিংস এবং বিপ-বী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের পুলিসী হেনস্থা থেকে র(া করেছিলেন।

যে সমস্ত রাজা, মহারাজা ও জমিদার ব্রিটিশবিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে নানাভাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অন্যতম। অন্য রাজা ও জমিদাররা শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিলেও মণীন্দ্রচন্দ্র এই আন্দোলনে যুক্ত(থাকেন। [১৪২] শুধু তাই নয় জাতীয় কংগ্রেসের এবং বিপ-বী আন্দোলনে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সাম্প্রতিক গবেষণায় এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর বি(দ্ধে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। কাশিমবাজারের রাজপরিবার যে বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠায় প্রত্য(ভাবে সাহায্য করেছে সেকথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন ১৯০৫ এর ৭ ই আগস্টের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কলকাতার টাউন হলের ঐতিহাসিক সভায় প্রদত্ত ভাষণে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই কলকাতা টাউন হলে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মণীন্দ্রচন্দ্র ও আরও কয়েকজনকে ৩১.৭.১৯০৫ তারিখে বহরমপুর গ্র্যান্ট হলের একসভায় মুর্শিদাবাদের নাগরিকগণ নির্বাচিত করেন। কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এই সভায় মণীন্দ্রচন্দ্র নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেছিলেন। [১৪৩] তিনি তাঁর অত্যন্ত দীর্ঘ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণে বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা ভাষাভাষী জাতির উপর এটাই (বঙ্গভঙ্গ) সর্বাপে(া ধ্বংসাত্মক দুর্যোগ। [১৪৪] অতীব (ো ভের সঙ্গে তিনি বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার জনসাধারণ কি কি বিপদ ও অসুবিধার মধ্যে পড়বে তার উল্লেখ করেন। তিনি নিঃসংকোচে স্পষ্টভাবে বলেন, ব্রিটিশ শাসনের সৃষ্টির সঙ্গে আমার পরিবার (কাশিমবাজার রাজপরিবার) ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আমার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেন হেষ্টিংসের বন্ধু ছিলেন এবং এক অতি ভয়ঙ্ক র বিপদের সময় তাঁর জীবন র(া করেছিলেন। তাই আমি মনে করি সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার আমার বংশগত অধিকার আছে। ব্রিটিশ শক্তি(র সৃষ্টি এবং বিকাশের সঙ্গে জড়িত এক পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে একথা বলছি যে, বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত এক রাজনৈতিক মহাভুল হয়েছে এবং সরকারের উচিৎ এর নির্দেশাবলী এবং পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা। [১৪৫] বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য 'ইংলিশম্যান' ও 'দি স্টেট্‌সম্যান' এই দুখানি ইংরেজি পত্রিকার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তিনি তাঁর ভাষণে গোটা দেশের জনসাধারণকে যতদিন বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রত্যাহার না করা হয় ততদিন এর বি(দ্ধে শক্তি(শালী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান

জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে সকলের এটা বোঝা উচিত যে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন শুধু উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই আন্দোলনে আপামর জনসাধারণ যোগদান করেছে।[১৪৬] তাঁরই উদ্যোগে ঐ সভায় বঙ্গভঙ্গের বি(দ্ধে স্বদেশী ও বয়কটের কর্মসূচীর উপর গু(ত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৪৭]

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী শুধু স্বদেশী আন্দোলন নয় ১৯২৯ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্বদেশী শিল্প, শি(া ইত্যাদির বিকাশে এবং জাতীয় কংগ্রেসের এবং বিপ-বীদের আন্দোলনে নানাভাবে অবদান রেখেছেন। ব্রিটিশ পুলিশ, গোয়েন্দা দপ্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বি(দ্ধে সবসময় সতর্ক গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিল এবং তাঁর সমস্ত জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ রেকর্ড করে রেখেছিল।[১৪৮] ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সি আর ক্লীভল্যান্ড তাঁর ১১/৯/১৯১১ তারিখের রিপোর্টে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সম্পর্কে লিখেছেন যে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বি(দ্ধে আন্দোলনকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তি(দের অন্যতম।[১৪৯] বঙ্গভঙ্গের বি(দ্ধে আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে গঠিত 'ন্যাশনাল ফান্ড'- এর তিনি ট্রাস্টী হয়েছিলেন। কৃষ(কুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং লিয়াকৎ হোসেনের মত অনেক চরমপন্থী এবং বিপ-বী এই ফান্ডের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ছিলেন।[১৫০] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের উপর আরোপিত শাস্তিমূলক কার্লাইল সার্কুলারের বি(দ্ধে গঠিত এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটিকে 'ন্যাশনাল ফান্ড' অর্থ সরবরাহ করতে থাকে। ক্লীভল্যান্ড অভিযোগ করেছেন এটা জেনেও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এই ফান্ডকে ৫০০০ টাকা দান করেছেন।[১৫১] মণীন্দ্রচন্দ্র স্বদেশী আন্দোলন, জাতীয় বি(বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য আহুত এক গোপন সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য যে 'জাতীয় শি(া পরিষদ' গঠিত (১৯০৫) হয়, তাতেও তিনি অর্থ প্রদান করতেথাকেন।[১৫২] গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় মণীন্দ্রচন্দ্র নিম্নলিখিত ভাবে এই পরিষদকে অর্থ প্রদান করেছিলেন।[১৫৩]

আর্থিকবছর	অর্থ
১৯০৮-০৯	২,০০০ টাকা
১৯০৯-১০	৮,০০০ টাকা
১৯১০-১১	৬,০০০ টাকা

তিনি 'ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ'এর প্রতিষ্ঠার জন্য ৪০০০ টাকা দিয়েছেন। 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল', জাতীয় বীমা কোম্পানীগুলো 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক', 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক' 'ধর্ম সমবায়' ইত্যাদি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি প্রচুর টাকা দিয়েছেন।[১৫৪] তিনি মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।[১৫৫] ব্রিটিশ সরকার তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাঁর 'মহারাজা' উপাধি কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেয় এবং সরকার তাঁকে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন। এতে ভীত না হয়ে তিনি জবাবে বলেছিলেন যে, 'মহারাজা মণীন্দ্র অপে(া মণীন্দ্র বাবু অনেক ভাল'।[১৫৬] পরবর্তীকালে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্নভাবে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে সহযোগিতা করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর শোকসভায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'প্রথম স্বদেশী ও বয়কট মিটিং এ (টাউন হলে) সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দেশের সেবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। যে দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেলেন তা অনুসরণের দ্বারা তাঁর অ(য় স্মৃতিকে ধরে রাখতে হবে'।[১৫৭]

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন এবং কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন মুর্শিদাবাদে স্বদেশী আন্দোলনে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি চার্জ ও অন্যান্য দমননীতির জন্য ১৯০৬ এর বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে চূড়ান্ত বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ ১৯০৬ এর বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিকসম্মেলনকে সফল করে তোলে।[১৫৮] বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১৫০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সঞ্জিবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ(কুমার মিত্র, 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, দীন মহম্মদ, আবুল গফুর প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই সম্মেলনে যোগদান করেন।[১৫৯] সম্মেলনে বেশীর ভাগ প্রস্তাব স্বদেশী ও বয়কটকে কেন্দ্র করে গৃহীত হয়েছিল। এই সম্মেলনে গৃহীত চতুর্থ প্রস্তাবে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে এবং স্বদেশী শিল্প এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশের মাধ্যম হিসাবে স্বদেশী ও বয়কটকে এই সম্মেলনে আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছে।[১৬০] স্বদেশী শিল্প, জাতীয় শি(া এবং জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের উপর প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতীয় শি(ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিপিনচন্দ্র পাল।[১৬১] অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা এই সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্য মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের উচ্ছাসিত প্রশংসা করে সম্মেলন সম্পর্কে কলকাতার পত্র পত্রিকাগুলি বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে।[১৬২] একই

MURSHIDABAD 3RD CD B # 133
26-9-03

ভাবে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারে কবিগু(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সম্মেলনকে সফল করে তোলা হয়।[১৬৩] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণের সহযোগিতায় এই সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিকাশে মুর্শিদাবাদের অবদান সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছিলেন, সাহিত্য পরিষদের নতুন মন্দির মুর্শিদাবাদের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রদত্ত জমির উপর নির্মিত হয়েছে। এর দ্বিতল নির্মিত হয়েছে লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের অর্থ দ্বারা এবং মুর্শিদাবাদের শ্রীনাথ পাল একতলার মেঝের চূড়ান্ত কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছেন। আমাকে (মা করবেন, পরিষদের বর্তমান সম্পাদক মুর্শিদাবাদের লোক হিসাবে যদি মুর্শিদাবাদ ও সাহিত্য পরিষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্মরণ করে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি। সম্মেলনে স্বদেশী শিল্পের সাথে সাথে স্বদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর গু(ত্ব আরোপ করা হয়। [১৬৪] রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে প্রতিটি বাঙ্গালী যদি তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে চর্চা করে তাহলেই বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটবে এবং এই রকম সম্মেলনের ল(্য পূরণ হবে। [১৬৫]

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ও জেলার পত্র পত্রিকা ঃ স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে জেলার পত্র পত্রিকাগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। [১৬৬] 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি ১৬ ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনটি কি ভাবে কলকাতা এবং মফঃস্বলে হরতাল, মিটিং, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে পালন করা হয়েছে তার উপর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ১৮/১০/১৯০৫ তারিখের একটা বিশেষ সংখ্যা বের করে। [১৬৭] এই পত্রিকার একজন প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সরকারের ভারত থেকে খাদ্য রপ্তানীর তীব্র সমালোচনা করে। [১৬৮] পত্রিকাটিতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে একজন পাঠক সখারাম গনেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' পাঠ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। এই গ্রন্থখানির সীমাহীন জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে পত্রলেখক পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে পবিত্র গীতার মতই 'দেশের কথা' পাঠ করা উচিত। তাহলে সকলে ইংরেজদের স্বার্থপরতা,সংকীর্ণতা এবং কাপু(যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। [১৬৯] ১৯০৬ এর ২৮ শে জুলাই সংখ্যা 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' লেখে যে, মি. মর্লের বঙ্গভঙ্গ একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থা, এই বক্তব্যের একটাই জবাব , তা হ'ল স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে আরও জোরদার করা। [১৭০] এই পত্রিকাটি পাট চাষ এবং পাটশিল্পকে একচেটিয়া ভাবে ইউরোপীয়দের স্বার্থে লাগানোর জন্য ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে। পত্রিকাটি তার ২২/১/১৯০৮ ও ১৮/২/১৯০৮ তারিখের সংখ্যাগুলোতে স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের উপর পুলিশী অত্যাচার বন্ধ করতে সরকারের কাছে দাবী জানায়। [১৭১] জেলার অন্যান্য পত্রিকাগুলোও একইভাবে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে শক্তি(শালী করতে সাহায্য করে। 'প্রতিকার' নামক পত্রিকাটি তার ২৪/৪/১৯০৮ তারিখের সংখ্যায় এই আনন্দ প্রকাশ করে যে বঙ্গভঙ্গের প্রধান হোতা লর্ড কার্জনকে ব্রিটিশ 'ল-কোর্ট' জরিমানা করে শাস্তি দিয়েছে। [১৭২]

রাজনৈতিক আন্দোলন ঃ ১৯২০-১৯৪৭

১৯২০ সাল থেকে ভারতের রাজনীতিতে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ জেলাকেও তা স্পর্শ করে। ঐ বছর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানালে জননেতা ব্রজভূষণ গুপ্তের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষও তাতে সামিল হন। তাঁর সভাপতিত্বেই ১৯২১ সালে বহরমপুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়েছিল।[১] মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্ণধার ছিলেন। ব্রজভূষণ গুপ্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুরোধেই মুর্শিদাবাদ জেলায় অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[২] বহরমপুর কৃষ(নাথ কলেজের ছাত্রগণ, যারা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে বি(বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত ডিগ্রী পুড়িয়ে ফেলে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রজভূষণ গুপ্ত তাদের দায়িত্বও গ্রহণ করেন।[৩] এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে বৈকুণ্ঠ সেনের যুগ বা উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণীর প্রাধান্যের অবসান ঘটেছিল।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারী শাসনের বি(দ্ধে বেলডাঙ্গা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার গরীব কৃষকদের প(আইনী লড়াইয়ে জয়লাভের মধ্য দিয়ে প্রখ্যাত আইনজীবি ব্রজভূষণ গুপ্ত জনচিত্তে যে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন, সম্ভবতঃ তা তাঁর মানসিকতায় গভীর পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনীতিতে তিনিই প্রথম সাধারণ মানুষকে সাথে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত করেন এবং কংগ্রেস এই প্রথম গণচরিত্র লাভ করে।[৪]

অসহযোগ আন্দোলন ঃ ব্রজভূষণ গুপ্তের নেতৃত্বেই বহরমপুর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'কর্মকুটীর'। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক শি(া শিবির, যেখানে ত(ণ কংগ্রেস কর্মীদের জাতীয়